কর্ণে পৌঁছিলে তিনি তাঁহার স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করেন এবং রামানুজ একথা জানিবার পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া শ্রীরঙ্গমে চলিয়া যান। রামানুজ গৃহে প্রত্যাগমনের পর সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সাশ্রু নয়নে তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন—"তোমার পাপভার পূর্ণ হইয়াছে। প্রথমতঃ তুমি আমাকে মহাপূর্ণের প্রসাদগ্রহণ হইতে বঞ্চিত করিয়াছ, দ্বিতীয়তঃ ক্ষুধার্ত্ত শ্রীবৈষ্ণবকে অন্নদানে অস্বীকৃত হইয়াছ; এক্ষণে তুমি আমার গুরুদেবকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া আমাকে পাপে মগ্ন করিয়াছ। তুমি জান না যে আমার গুরুদেব—আমার স্ত্রী, আমার নিজজীবন, এমন কি আমার ইহ ও পরজন্মের সকল কাম্যবস্তু অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। সত্য, আমার ন্যায় দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে তোমার মত স্ত্রী অতি ভয়ঙ্করী। তুমি আমার ধর্ম্মপথের সহায়তা না করিয়া আমার প্রাণ ও আত্মা উভয়কেই নষ্ট করিতে বসিয়াছ। তোমাকে আমি বারবার সাবধান করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে পিত্রালয়ে যাইতে হইবে। তোমার যাহা কিছু লইতে ইচ্ছা হয়, তাহা লইয়া প্রস্তুত হও।" এই কথা শুনিয়া রামানুজপত্নী ভয়ে শঙ্কিত হইয়া কম্পিতকলেবরে জড়পদার্থের ন্যায় দণ্ডায়মানা রহিলেন। রামানুজ সহজে ক্রোধের বশীভূত হইতেন না, তিনিও শান্তভাব ধারণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার স্ত্রীকে স্থানান্তরিত করিবার ইচ্ছা তাঁহার মন হইতে তিরোহিত হইল না।

একদিন রামানুজ বরদরাজের মন্দিরে দেবসেবায় নিযুক্ত আছেন, এমন সময় একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি ক্ষুৎপিপাসায় অতিশয় কাতর হইয়াছেন; এজন্য তাঁহার নিকট কিঞ্চিৎ অন্নভিক্ষা করিতেছেন। রামানুজ বলিলেন, "আমি এখানে দেবকার্য্যে নিযুক্ত আছি; আমার বাড়ী যাইবার অবসর নাই। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার বাটীতে গমন করিয়া আমার স্ত্রীর নিকট আমার নাম করিয়া উপস্থিত হউন, তিনি আপনাকে পরিতোষের সহিত আহার করাইবেন।" এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ রামানুজপত্নীর নিকট যাইয়া অন্ন প্রার্থনা করিলেন। কটুভাষিণী রামানুজপত্নী ব্রাহ্মণকে তাঁহার দারিদ্র্য উপলক্ষ করিয়া নানাপ্রকার কটুবাক্যে তিরস্কারপূর্ব্বক ফিরাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ এইরূপে অপমানিত ও মর্ম্মাহত হইয়া রামানুজের নিকট প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সকল কথা অবগত করাইয়া বলিলেন—"আপনি কি আমাকে এইরূপে অপমান করাইবার জন্যই আপনার স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন?" ইহাতে রামানুজ অতিশয় দুঃখিত হইয়া সেই দিনই তাঁহার স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তৎপরে একখানি পত্র ও নানাবিধ বস্ত্রাদি উপঢৌকন দিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে, আপনি আমার স্ত্রীর নিকট যাইয়া বলুন যে তাঁহার ভ্রাতার বিবাহ সন্নিকট, সেজন্য আপনি তাঁহার পিত্রালয় হইতে তাঁহাকে লইতে আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ সেই সকল উপঢৌকনাদি সহ পত্রখানি লইয়া রামানুজপত্নীকে বলিলেন যে, তিনি প্রথমে ছলনা করিয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহার পিত্রালয় হইতে তাঁহাকে লইতে আসিয়াছেন। তৎপরে সেই পত্র এবং দ্রব্যাদি তাঁহাকে প্রদান করিলেন। রামানুজপত্নী পত্রখানি পাঠ করিয়া এবং নানাবিধ মূল্যবান বস্ত্র এবং উপঢৌকনাদি দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে, তাঁহাকে অভুক্ত অবস্থায় ফিরাইয়া দিয়া তিনি অতি কুকর্ম্মই করিয়াছেন। এই বলিয়া তাঁহাকে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী দ্বারা পরিতোষের সহিত আহার করাইলেন এবং নিজ পিতা মাতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়স্বজনের সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণও রামানুজ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া সেই সকলের যথাযথ উত্তর দিয়া রামানুজপত্নীর বিশ্বাসভাজন হইলেন। ইত্যবসরে রামানুজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি আসিবামাত্র তাঁহার পত্নী তাঁহাকে আনন্দের সহিত সকল কথা অবগত করাইয়া পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রামানুজ বলিলেন, "হে সুভগে, তোমার ভ্রাতার বিবাহ উপলক্ষে আমাদের উভয়েরই তথায় উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য; তবে আমার কিছু কার্য্য আছে, সেজন্য তুমি এই ব্রাহ্মণের সহিত গমন কর, আমি নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইব।" তৎপরে রামানুজপত্নী তাঁহার পিতৃদত্ত বসনভূষণ, দানসামগ্রী ও দাসদাসী সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মণের সহিত পিত্রালয়ে গমন করিলেন। সে-ই তাঁহার জন্মের মত পতিগৃহত্যাগ; ইহার পর রামানুজ তাঁহাকে চিরতরে অন্তরাল করিলেন।

এই ঘটনার পর রামানুজ সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তৎপরে অনন্তসরোবরে অবগাহন করিয়া বরদরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, প্রভু, আমার সংসারের সকল সুখ পরিতৃপ্ত হইয়াছে; এক্ষণে আমাকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া চিরদিন আপনার চরণসেবা করিবার উপযুক্ত করুন। তৎপরে তিনি নম্বীকর্ত্তৃক সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রামানুজমুনি নাম গ্রহণ করিলেন।

ঠোঙ্গাপ্রস্তুত।

আমার গৃহে প্রতি সপ্তাহে বিস্তর খবরের কাগজ সংগৃহীত হয়। সেইগুলি হইতে আমি যেগুলি কাটিয়া রাখা আবশ্যক মনে করি, তাহা কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট অংশ স্তূপাকার করিয়া রাখিয়া দিই। অবশেষে চাকরেরা পুরাতন কাগজওয়ালা ডাকিয়া আনিলে তাহাকে ঐ কাগজগুলি বিক্রয় করিয়া দিই এবং চাকরেরা সেই পয়সা ভাগাভাগি করিয়া লইয়া 'পানসুপারি' কিনিবার ব্যবস্থা করে। পূর্ব্বে সাধারণত একসের কাগজ (Statesman প্রভৃতি ইংরেজী কাগজ) চারি আনায় বিক্রয় হইত এবং অন্য বাংলা প্রভৃতি কাগজ দুই আনায় সের বিক্রয় হইত। যুদ্ধের সময় ইংরেজী কাগজের দর আট আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। কিন্তু সে দিন এক কাগজওয়ালা দর বলিল ছয় পয়সায় সের। আমি তো অবাক হইয়া গেলাম। অবশেষে আমি Salvation Armyর কাগজের আড়তে দর জানিতে পাঠাইলাম। সেখানে জানা গেল, অনেক ইংরাজ তাহাদিগকে কাগজ পাঠাইয়া দেন এবং তাহারা সাধারণত মুসলমান ঠোঙ্গাওয়ালাদিগকে কাগজ বিক্রয় করে। ইহা শুনিয়া আমার মনে আসিল যে, হিন্দু বিধবা প্রভৃতি মহিলারা যদি ঠোঙ্গা প্রস্তুত করেন, তবে তাঁহাদের বিশেষ লাভ হইতে পারে। শুনিয়াছি ইহাতে শতকরা একশত টাকা বা cent per cent লাভ হয়! আমি যথাসাধ্য কাগজ যোগাইবার এবং ঠোঙ্গা প্রস্তুত হইলে দোকানদারদের মধ্যে উহা বিক্রয় করিবার ব্যবস্থার চেষ্টা করিতে পারি। কোন পাঠক বা পাঠিকা যদি এ বিষয়ের ভার গ্রহণ করেন, তবে আমার সাধ্যমত আমি তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইহাতে আমাদের জাতির ও দেশের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে।

৫।১ বি, বারাণসী ঘোষের সেকেণ্ড লেন,
(রাজেন্দ্রমল্লিকের ষ্ট্রীট হইতে)
সিংহীবাজার, জোড়াসাঁকো
কলিকাতা। — শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গ্রন্থ-পরিচয়।

(শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এস্-সি)

সাধক কমলাকান্ত—শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীঅম্বিকাচরণ নাথ বি-এল, রিপণ লাইব্রেরী—ঢাকা।

গ্রন্থটী পড়িয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। গ্রন্থকারের 'রামপ্রসাদ' সম্বন্ধে আমরা যে মত প্রকাশ করিয়াছি, এই গ্রন্থ সম্বন্ধেও আমাদের সেই মত অব্যাহত আছে। গ্রন্থকার যে সাধকের জীবনীর উপকরণ সংগ্রহের জন্য রীতিমত খাটিয়াছেন, তাহা পত্রে পত্রে দেদীপ্যমান। কমলাকান্তের অনেকগুলি সঙ্গীত এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থকারের চেষ্টা ও উদ্যম কেবল প্রশংসনীয় নহে—ভবিষ্যজীবনী-লেখকগণের অনুকরণীয়। এত পরিশ্রম করিয়া জীবনী লেখা এই দেশে আর কেহ করিয়াছেন কি না জানি না; আমরা গ্রন্থকারের লেখনী হইতে এইরূপ আরও গ্রন্থের আশা করি। গ্রন্থের ভাষা স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল। ইহাতে অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান চিত্রও আছে। কাগজ ও ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

গ্রহবিপ্র ইতিহাস—শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ সঙ্কলিত। মূল্য ১৲ টাকা। ৯৬/১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীটস্থ 'বেদাঙ্গচতুষ্পাঠী'-গ্রন্থকার-ভবন হইতে শ্রীদিগিন্দ্রনাথ পাঠক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থকার অতি নিপুণভাবে গ্রহবিপ্রগণের ইতিহাস পুরাণাদি শাস্ত্র সাহায্যে আলোচনা করিয়াছেন। সমাজতত্ত্বান্বেষী পাঠকগণের নিকট ইহা উপাদেয় বোধ হইবে। আমরা ব্রাহ্মণ্যাভিমানী অন্য শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণগণকে এই গ্রন্থটী পাঠ করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করি। আমরাও গ্রন্থকারের সহিত একতানে গ্রহবিপ্রগণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীরনাথ-প্রসঙ্গ—ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের দর্শনাধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ—হেডমাষ্টার ফেণী হাইস্কুল। মূল্য লেখা নাই।

এই গ্রন্থে জনসাধারণ যাহাতে মহাপুরুষ গম্ভীরনাথকে ঠিক করিয়া বুঝিতে পারে, গ্রন্থকার সেই বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা যে সফলতা লাভ করিয়াছে, তাহা গ্রন্থটী পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যায়। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে গম্ভীরনাথের সকল দিক ভক্তচক্ষে কিরূপ প্রতিভাত হয় তাহা বেশ খুলিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন। আনুষঙ্গিকরূপে তিনি কিছু-কিছু দার্শনিক আলোচনাও করিয়াছেন। এই আলোচনার স্থলবিশেষে আমাদের মতভেদ থাকিলেও মোটের উপর গ্রন্থটী যে বেশ সুখপাঠ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

'রাম-রাজত্ব' ও 'টাকার মাহাত্ম্য'—শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন বি-এ প্রণীত। শ্রীপরমেশকুমার রায় ২০/বি দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। উভয় পুস্তিকাই কতিপয় গদ্য ও পদ্যের

সম্বন্ধ। ১৪-১৫ পাতার চটী বই। প্রত্যেকটী পুস্তিকার মূল্য ৵০ আনা।

ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব ও প্রার্থনা—শ্রীরামচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। গ্রন্থ পাইবার ঠিকানা—১০৫ বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা; অথবা জেলা খুলনা, পোঃ আঃ ছয়ঘরিয়ার অন্তর্গত আম্রতলা গ্রাম—গ্রন্থকারের নিকট। মূল্য ১৲ টাকা।

এই লেখক সরল ভাষায় নিপুণ ভাবে প্রার্থনার বিষয় ও আনুষঙ্গিকরূপে ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে কতকগুলি প্রার্থনাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রার্থনাগুলি হৃদয়স্পর্শী ও মনোরম। আমরা গ্রন্থকারের নিকট এই জাতীয় আরও গ্রন্থের আশা করি।

আত্মোন্নতি—শ্রীভুবনমোহন দাস এম-এ প্রণীত। প্রকাশক বি কে দাস ১০/এ শ্রীনাথ দাসের লেন, কলিকাতা। মূল্য ॥০ আনা।

৫২ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে গ্রন্থকার নিপুণতার সহিত সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন; দুই-এক স্থানে আমাদের মত-পার্থক্য থাকিলেও অধিকাংশ মতের সহিত আমাদের বিন্দুমাত্র অমিল নাই। ভগবান যখন আমাদের অন্তরেই রহিয়াছেন, তখন আর উপাসনার আবশ্যক কি? এই প্রশ্নের শাস্ত্রকারগণ প্রদত্ত যে সুন্দর উত্তরটি গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা উদ্ধৃত করিয়া দিবার প্রলোভন আমরাও সংবরণ করিতে পারিলাম না। উত্তরটি হইল—"ঘৃত দুগ্ধের মধ্যে থাকিয়া গাভীর দেহেই বর্ত্তমান থাকে, তথাপি তাহাতে তাহাদের শরীর পুষ্ট হয় না; কিন্তু ঐ দুগ্ধই যখন তাহাদের শরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া পরে উপায়বিশেষ দ্বারা ঘৃতাকারে পরিণত হয়, তখন তাহাই আবার গাভীর ঔষধরূপে উপকার করিয়া থাকে, তদ্রূপ পরমেশ্বর সমস্ত দেহীর দেহে বিদ্যমান থাকিলেও উপাসনারূপ উপায় ব্যতিরেকে মনুষ্যের হিতসাধক হন না।" ছাপা ও কাগজ ভাল।

পুত্রের প্রতি উপদেশ—শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান ৫নং রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন (মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের নিকট) বহুবাজার পোঃ অঃ—কলিকাতা।

পুস্তিকাটী আমাদের অতি উপাদেয় লাগিল। আজকালকার দিনে যখন অধিকাংশ পিতাকেই আপন আপন কার্য্যে এত অধিক ব্যাপৃত থাকিতে হয় যে, তাঁহারা ইচ্ছা থাকিলেও স্বীয় পুত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারেন না, তখন তাঁহারা যদি স্ব স্ব পুত্রের হস্তে এই পুস্তিকার এক-এক খণ্ড প্রদান করেন তবে তাহারা পিতার উপদেশের অভাবেও প্রকৃত সৎপথ নির্ব্বাচনে ক্লেশ পাইবে না। পুস্তকের ভাষা সুন্দর—ছাপা ও কাগজও উত্তম। আমরা আশা করি, প্রত্যেক পিতা তাঁহার পুত্রকে এই পুস্তিকার এক-এক খণ্ড উপহার দিবেন।

Sorrows of Akhtar—খাঁ সাহেব আবদুল বালি M. A. S. B প্রণীত। লিটন্যান, থ্যাকার স্পিঙ্ক এবং ৩নং আলিমুদ্দীন ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ॥০ আনা।

অযোধ্যার শেষ নবাব বাজিদ্ আলি সাহেবের জীবনের দুঃখময় কাহিনী গ্রন্থকার অতি করুণ ভাবে ইংরাজীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই কাহিনী আদ্যন্ত শোকপূর্ণ। পাঠ করিতে করিতে ভাগ্যহীন নবাবের প্রতি সহানুভূতিতে চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

প্রাচীন চিত্র—শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী প্রণীত। ৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥৵০ আনা।

বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্যজগতে সুপরিচিত। এই গ্রন্থে শকুন্তলা, কাদম্বরী ও উত্তররামচরিতের কয়েকটী চরিত্র সমালোচনা আছে। সমালোচনাগুলি বর্ণনামূলক। যাঁহারা ঐ সকল সংস্কৃত কাব্য পাঠ করেন নাই, তাঁহারাও ইহার কাব্যরসপূর্ণ সমালোচনাগুলি উপভোগ করিতে পারিবেন। আমরা গ্রন্থকারের নিকটে এইরূপ আরও অধিক চিত্র-রচনা আশা করি।

পদপরিচয় বা parts of speech—শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায় প্রণীত। ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।

প্রশ্নোত্তরলিখিত প্রথায় সরসভাবে ব্যাকরণশিক্ষাদান আমাদের দেশে বোধ হয় প্রথম হিমাংশু বাবুই দেখাইলেন; কিন্তু প্রথম হইলেও ইহা সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। শিক্ষক মহাশয়গণ যদি এই প্রথায় শিক্ষাদান করেন, তাহা হইলে বোধ হয় ইংরাজী ব্যাকরণের বিভীষিকা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইবে।

রত্নদ্বীপ—উপরিউক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ গ্রন্থকার Stevenson-এর Treasure Island অবলম্বনে ঘরোয়া ভাষায় গল্পটি বলিয়াছেন। ঘরোয়া ভাষায় গল্পটি লিখিত হওয়ায় পশ্চিম বঙ্গের বালকগণ ইহা রীতিমত উপভোগ করিবে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকারের বলিবার ভঙ্গীটি সুন্দর। মূল্য দশ আনা।

সংবাদ।

পুণ্যাহ—গত ১৭ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে কালীগ্রাম পরগণার শুভ পুণ্যাহ কর্ম্ম পতিসর সদর কাছারীতে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় আহূত হইয়া কলিকাতা হইতে তথায় গমন করিয়াছিলেন। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ণ বেলা ১০॥ ঘটিকায় প্রচুর বাদ্যোদ্যম ও ঘন ঘন বন্দুকের শব্দ দ্বারা পুণ্যাহের শুভসূচনা দিকে দিকে বিঘোষিত হইল। অতঃপর পত্রপুষ্প ও প্রতিকৃতি দ্বারা সুসজ্জিত সভাগৃহ ধীরে ধীরে উপস্থিত আমলা-কর্ম্মচারী ও প্রজাপুঞ্জে পূর্ণ হইলে বেলা একাদশ ঘটিকায় বেদান্ততীর্থ মহাশয় বেদীগ্রহণ করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ ভাগে অন্য একটী উচ্চতর বেদীতে পূজ্যপাদ মহর্ষিদেব ও তাঁহার পূজনীয় পুত্রগণের প্রতিকৃতিগুলি পুষ্পমালায় ভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছিল। অতঃপর যথারীতি ব্রহ্মোপাসনা সমাধাপূর্ব্বক আচার্য্য মহাশয় উপস্থিত প্রজা-পুঞ্জকে উদ্দেশ করিয়া সরল ভাষায় রাজভক্তি বিষয়ে একটী নাতিদীর্ঘ সুন্দর উপদেশ প্রদান করিলেন; তখন ষ্টেটের কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের নেতৃত্বে পুণ্যাহের প্রচলিত অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। গাঁতিদার, জোতদার প্রভৃতি বড় বড় প্রজারা একে একে আসিয়া ম্যানেজার মহাশয়ের হাতে পুণ্যাহের নিমিত্ত পূর্ব্বসংগৃহীত কাগজে মোড়া টাকাগুলি দিতে লাগিল এবং দুইজন হিসাব-নবিস সিন্দুররঞ্জিত মুদ্রাঙ্কিত নূতন খাতায় উহা যুগপৎ লিখিতে লাগিলেন। লেখা হইয়া গেলে কাগজের মোড়কগুলি আলিপনা দেওয়া একটী নূতন কলসীতে রাখা হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে কপালে চন্দন, গলায় পুষ্পমালা ও পরিধেয়ে অলক্তক লাগাইয়া এবং পানসুপারী ও বাতাসা উপহার দিয়া প্রচলিত প্রাচীন পদ্ধতিতে প্রজাবর্গের অভিনন্দন চলিতে লাগিল। এইরূপে বেলা প্রায় ৩ ঘটিকায় সময় পুণ্যাহের প্রকৃত অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইল। অতঃপর বেলা ৪ ঘটিকায় সময় কাছারী বাড়ীর বহিরঙ্গণে ও নদীতীরে সমবেত প্রজাপুঞ্জ, অতিথি, অভ্যাগত ও রবাহুতের জন্য 'দধি-চিঁড়া'র একটী সুমহৎ ভোজের আয়োজন হইল। বহুদূরব্যাপী স্থানের মাঝে মাঝে এক একখানি তক্তা-পোষের উপর স্তূপীকৃত চিপিটক ও দধিভাণ্ড দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়; এই উপলক্ষে প্রায় তিন হাজার লোককে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করান হইল। এই ভোজের ব্যাপার সম্পন্ন হইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। কাজেই দয়ন্যভাবে অসমর্থ দরিদ্রদিগকে বস্ত্র ও অর্থদান ব্যাপারটী আগামী কল্যের জন্য স্থগিত রাখিয়া পরিশ্রান্ত জনগণ আজিকার মত বিশ্রামের আয়োজন করিল। গ্রাম্য ঢুলিদের পুণ্যাহের শেষ বাজনা বাজাইবার আগ্রহে, ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়া শ্রেণী বাঁধিয়া গৃহাভিমুখী প্রজাপুঞ্জের কোলাহলে এবং 'নাগর'-নদীর উচ্ছল জলকল্লোলে পল্লীর নিঃশব্দ সান্ধ্যাকাশ মুখর হইয়া উঠিল—এ বৎসরের মত পুণ্যাহের পবিত্র অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইল।

তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা—এই সুপ্রাচীন পত্রিকা-খানি যে বর্ত্তমানে সর্ব্বসম্প্রদায়ের ও সর্ব্বসাধারণ পাঠকেরই মনোরঞ্জন ও প্রীতি উৎপাদন করিতেছে তাহার কিছু কিছু নিদর্শন আমরা গত সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি। এবারে গত আষাঢ়-সংখ্যায় প্রকাশিত 'প্রাচ্যসঙ্গীতের বাণী' ও 'নীরব ভগ্নীসম্প্রদায়' সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ সাহিত্যিক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের এবং ঢাকা হইতে প্রকাশিত ঊনবিংশ বর্ষের প্রাচীন সাপ্তাহিক 'শিক্ষাসমাচারের' অভিমত পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত সাদরে উদ্ধৃত করিলাম; এবং বরিশাল হইতে প্রকাশিত ৪৬ বৎসরের প্রাচীন সাপ্তাহিক "কাশীপুর-হিতৈষী" তত্ত্ব-বোধিনী সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন তাহাও প্রকাশ করিলাম।

"প্রীতিভাজনেষু—আষাঢ়ের তত্ত্ববোধিনীতে শ্রীমতী বাণী দেবীর "প্রাচ্য সঙ্গীতের বাণী" পড়িয়া বড়ই সুখী হইলাম। দেবীর পরিচয় আমি জানি না। জানিতে ইচ্ছা করি। প্রাচ্য সঙ্গীতের প্রাণ ও মর্ম্মকথা তিনি ঠিক ধরিয়াছেন এবং তাহা ঐ প্রবন্ধে প্রাঞ্জলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এইজন্য আপনার হাত দিয়া তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ পাঠাইলাম। ইতি—

আপনার রাখী-ভ্রাতা—শ্রীদীননাথ সান্ন্যাল।

কৃষ্ণনগর, ২৩।৭।২৬"

"লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, বহু উচ্চভাবাত্মক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্পাদক-তায় "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" বর্ত্তমান সময়ে প্রশংসনীয় রূপে পরিচালিত হইতেছে। পত্রিকাখানি মাসে মাসে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে, আষাঢ়-সংখ্যা আমা-দের হস্তগত হইয়াছে। বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, ৫৫নং আপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে এই পত্রিকা মুদ্রিত হয়। পত্রিকার মূল্য আদিব্রাহ্মসমা-জের কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হয়।

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বহুকালাবধি বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে বহু প্রয়োজনীয় তত্ত্বকথা প্রচার করিয়া আপন নামের সার্থকতা সাধন করিয়া আসিতেছেন। এক

সময়ে ইহার এমন গৌরবের দিনও ছিল যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইহার আশ্রয়দাতা এবং অমর লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার সম্পাদক ছিলেন।

"আলোচ্য সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ সম্পাদক স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"ধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতা ও তদ্বিবারণ" ধর্ম্মবিষয়ে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিরোধ বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে রাজা রামমোহন ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন; ব্রহ্মমন্ত্রের দুইটি অঙ্গ, ভগবৎ প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন, ইহাই প্রবন্ধের মূলকথা। ধর্ম্মের বহিরাবরণ পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ হইতে হইবে, ইহাতেই ব্যক্তির এবং সমাজের কল্যাণ,—অতি উচ্চ উদার সসার কথা। কিন্তু কার্য্যতঃ এই অবস্থা লাভ কিরূপে হইতে পারে তাহার পন্থা নির্দ্দেশ আবশ্যক, সে বিষয়ে প্রবন্ধে কোন আলোচনা নাই। "উড়িষ্যায় পাঠান মোগল ও মারহাট্টা-শাসন" পাঠযোগ্য সুপ্রবন্ধ। "নীরব ভগ্নী সম্প্রদায়" সম্পাদকের লেখনী-নিঃসৃত। পিয়ার্সন মেগেজিন অবলম্বনে প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছে। একান্ত ঈশ্বরানুরাগী ধর্ম্মপিপাসু সম্প্রদায়-বিশেষের জীবনে নীরবতা সাধনের যে কাহিনী বিবৃত হইয়াছে তাহা বড় মনোরম। আমরা প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিয়া আমাদের পাঠকবর্গকে পড়িবার সুযোগ প্রদান করিলাম। "প্রাচ্য সঙ্গীতের বাণী", "জ্যোতিরিন্দ্রনাথ" উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। "সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ" ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। সাংখ্যেরা নিরীশ্বরবাদী, লেখক এই মত নিরসনের চেষ্টা করিতেছেন।"

শিক্ষাসমাচার—১২ই শ্রাবণ, ১৩৩১

"বর্ত্তমান পৌষ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আমরা পাইয়াছি। বঙ্গের সুবিখ্যাত লেখক কলিকাতার ঠাকুর-বংশধরগণ স্বয়ং ইহার লেখক ও পরিচালক। পূর্ব্বকালের তত্ত্ববোধিনীর লেখা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনায় চলিত, বর্ত্তমান কালে নানবিধ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ উহাতে মুদ্রিত হইয়া থাকে। আমরা এই পুরাতন-কালীয় পত্রিকায় নবোদ্যম দেখিয়া প্রীতি লাভ করিতেছি; আশা করি, অনেকেই এই পত্রিকাখানির গ্রাহক হইবেন।"

কাশীপুরনিবাসী—২৬শে পৌষ, ১৩২৯

গার্হস্থ্য-সংবাদ।

সপিণ্ডীকরণৈকোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধ—বিগত ২৩শে শ্রাবণ রবিবার প্রাতঃকাল ৯ ঘটিকায় অমাবস্যা তিথিতে ৺তারিণীচরণ গুপ্ত মহাশয়ের সপিণ্ডীকরণ ও মাসিকৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ তদীয় সুযোগ্য পুত্র শ্রীসুধীরকুমার গুপ্ত মহাশয় কর্তৃক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদ-সম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসা বাটীতে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত দিবস যথাসময়ে পুষ্পমালা ও গন্ধধূপাদির পবিত্র সৌরভে সভাস্থলটী পূর্ণ হইলে প্রথমে এক প্রস্থ দানসামগ্রী ও ভোজ্যাদি উৎসর্গীকৃত হইল। অতঃপর আদিব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় বেদীগ্রহণপূর্ব্বক শ্রাদ্ধাধিকারী ও সমবেত ভদ্রজনগণকে উদ্বোধিত করিলেন। তাঁহার সেই নাতিদীর্ঘ সরল ও ভাবময় উদ্বোধনে শ্রাদ্ধের কর্ত্তব্যতা ও উপযোগিতা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেকগুলি চিন্তাযোগ্য কথা ছিল। অনন্তর যথারীতি শ্রাদ্ধকার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। ৺তারিণী বাবুর পুত্রবধূ শ্রীমতী মনোরমা দেবী কয়েকটী সঙ্গীত করিয়া সভাস্থলের পবিত্রতা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন প্রতিষ্ঠাপন্ন নরনারীর সমাগমে সভাস্থলের গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সর্ব্বশেষে একটী বিশিষ্ট ভোজের আয়োজন হইয়াছিল।

শোক-সংবাদ।

বিগত ১২ই শ্রাবণ বুধবার আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা লীলাদেবীকে অকালে হারাইয়াছেন। ইঁহার স্বামী একজন সুশিক্ষিত যুবক; তিনি এম্-বি এবং ডি-পি-এইচ। গত ১৯শে শ্রাবণ বুধবার চিন্তামণি বাবু পুনশ্চ আর একটী আঘাত পাইয়াছেন; তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী কমলা দেবী ঐ দিনে তাঁহার স্বামীকে হারাইয়াছেন। বিশেষ সম্ভ্রান্ত বংশে ইঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল। নিতান্ত অল্প বয়সেই এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিল। পরম পিতা তাঁহার সুশীতল ক্রোড়ে পরলোকগত আত্মাদুইটীকে স্থানদান করুন এবং শোকার্ত্ত আত্মীয়স্বজনের অন্তরে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

৺দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক।—ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ C. I. E. ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। রাজেন্দ্রবাবু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্থাপিত ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার ভগবানের উপর একান্ত নির্ভর ছিল। বিগত ৬ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ৪৪ বৎসর বয়সে আত্মীয়-স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দেবেন্দ্রনাথ দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। ভগবান তাঁহার আত্মাকে আপন ক্রোড়ে রক্ষা করিয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের অন্তরে সান্ত্বনা দান করুন।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
ভাদ্র, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

৯৯৭ সংখ্যা ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিযুগাব্দ ৫০২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩।

বন্ধু আমার।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১৪। প্রাপ্তিতে শান্তি।

বন্ধু হে! তোমাকে আজ একটা আশ্চর্য্য কথা বলিতে চাই—না বলিলে আমার প্রাণ হাঁপাইয়া মরিবে। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, তোমায় নাকি ভালবাসিলে তুমি তাহার যাহা-কিছু সমস্তই কাড়িয়া লও। কিন্তু কৈ—আমি তো পরীক্ষায় দেখিতেছি, সে কথা যাহার কাছে সত্য, তাহার কাছে সত্য, কিন্তু আমার কাছে তো সত্য বলিয়া মনে হইতেছে না। এই দেখ, আমি সেই কথা শুনিয়া আমার যাহা কিছু আছে সমস্ত, আমার সংসার, আমার প্রাণপ্রিয় পরিজন, আমার নিজের জীবন, সকলেরই আশা পরিত্যাগ করিয়া কি জানি কেন, তোমাকে ভালবাসিলাম। কিন্তু তোমার নিকট হে বন্ধু! সকলই বিপরীত—লোকে সাধারণত অগ্নির জ্বলনে দগ্ধ হইয়া শুকাইয়া যায়; কিন্তু তোমাকে ভালবাসিয়া যখন প্রেমের আগুনে জ্বলিতে থাকি, জ্বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার শান্তিজলের ছিটা পাইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে পরিপুষ্ট হইয়া উঠি। তোমাকে না দেখিয়া যখন নিতান্তই মরণ প্রার্থনা করি, তখন তুমি ক্ষণেকের জন্যও আসিয়া প্রাণের নূতনতর জীবনের ধারা ঢালিয়া দাও। তোমাকে না দেখিয়া জীবন যখন উত্তপ্ত শূন্য মরুভূমির ন্যায় বোধ হয়, তখন তুমি তোমার প্রেমধারা বর্ষণ করিয়া জীবনকে সিক্ত করিয়া শতবিধ শস্যে শ্যামল ক্ষেত্র এবং শতবিধ পুষ্পের সুগন্ধে সুরভিত করিয়া তোল। স্ত্রী পুত্র বিত্ত সংসার সমস্তই যখন তোমা বিহনে প্রতি পদে অসহ্য ভার বলিয়া মনে হয়, তখন জানি না, কি আশ্চর্য্য শক্তিতে আমার হৃদয়ে অপূর্ব্ব বলবিধান করিয়া সেই মহাভারকেও খুবই লঘু ও মধুময় করিয়া দাও। আমি দেখিতেছি, তোমাকে ভালবাসিলে সকলকেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়—সকলকেই নিজের পরিজন বলিয়া মনে করিতে পারি। এতদিন ধরিয়া যাহা কিছু শিখিয়াছিলাম যে, ভালবাসিলে কেবল ব্যথাই পাওয়া যায়, আজ তোমাকে ভালবাসিয়া আমার সে সমস্ত পূর্ব্বশিক্ষা ভুল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইতেছে—এখন দেখিতেছি, তোমায় ভালবাসিলে সকল ব্যথাই দূর হয়, দুঃখের আগুনে জল পড়ে, সংসার মরীচিকা হইবার পরিবর্ত্তে সত্য ও সুখের সংসার হইয়া দাঁড়ায়; তোমাকে বন্ধু বলিয়া পাইলে জগৎসংসারকেই বন্ধু বলিয়া মনে হয়; পূর্ব্বে পরকে আপনার করিবার জন্য কাঁদিতাম, এখন আপনাকে পর করিবার জন্য কাঁদি; এখন সকলের ভিতরেই তোমাকে পাইয়া আমার আকুল প্রাণ শান্ত হইয়াছে। বন্ধুগো—তুমিই আমার সব।

১৫। প্রেমভিক্ষা।

বন্ধু আমার! বন্ধু আমার! আজ তুমি

আমায় তোমার আলিঙ্গনে বদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছ? দাও—দাও—তোমার ঐ দুই বাহু বাড়াইয়া দাও—তোমার ঐ প্রশস্ত বক্ষে আমি ঝাঁপাইয়া পড়ি। আজ আমার কি সৌভাগ্য! বন্ধুগো! আমার আর কথা বাহির হইতেছে না। তোমার ঐ প্রেমে ভরা হৃদয়খানি খুলিয়া দাও, আমি তাহারই মাঝে নীরবে নিঃশব্দে গিয়া বসিয়া থাকি। আজ আমার নিকট চাঁদ হাসিতেছে; আজ আমার নিকট সমস্ত গ্রহতারা হাসিতেছে। আজ চারিদিক হইতে ফুলের সুবাস আসিয়া আমার চিত্তকে মাতাইয়া তুলিতেছে। না—না—ইহাই আমার ভাল—ইহাই আমার ভাল—আমি আর সংসারের কাজ করিতে পারিব না। না—বন্ধু—না—আমাকে ফিরাইয়া দিও না—আমাকে তোমারই পাশে জন্ম-জন্ম বসিতে দাও—তাহাতেই আমার সুখ, তাহাতেই আমার শান্তি। তোমার ঐ মধুময় দৃষ্টিতে আমার প্রতি কি অগাধ ভালবাসা প্রকাশ পাইতেছে—সে ভালবাসার প্রতিদানে আমি কতটুকুই বা দিতে পারি! সেটুকুই বা পারি, সেইটুকুই দিতে দাও; তোমার প্রেম উপভোগ করিয়া এবং তোমাকে আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া আমাকে প্রেমসাগরে অনুক্ষণ ডুবিয়া থাকিতে দাও। লোকে বলে—প্রেম যদি পাইতে চাও, তবে প্রেম চাহিও না। এ কথা আমি মানিতে পারি না। আমি তোমার প্রেমের ভিখারী—ভিক্ষাপাত্র লইয়া আমি বন্ধুর নিকট আসিয়াছি দেখিবার জন্য, বন্ধু ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করেন কি না। এ কি হইল—তুমি আমাকে আজ যে প্রেম দিলে, তাহাতে ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ হইয়া যে উছলিয়া উঠিল! আজ আমার জীবন মধুময় হইয়া উঠিল। মনে হইতেছে, এই মধুময় জীবন যেন নিজেই উচ্ছ্বসিত হইয়া শতস্রোতে বাহির হইয়া চলিয়াছে—সমস্ত জগতকে যেন নিজের মধুধারায় স্নিগ্ধ করিতে চাহিতেছে। তাহারই মধ্যে আমি যেন নীরব দর্শক হইয়া গভীর আকুলতার মাঝেও নিরাকুল হইয়া বসিয়া আছি। বুঝিয়াছি, জানিয়াছি, নিজের সুখদুঃখের উপর, নিজের জীবনের উপর আমার নিজের কোন অধিকার নাই। নিজেকে নিজের বলিয়া যতদিন জ্ঞান ছিল, ততদিন সুখদুঃখের তরঙ্গদোলায় সর্ব্বদাই দুলিতাম। এখন আমি আপনাকে তোমার কাছে বিকাইয়া দিয়া বড় আনন্দে আছি—কোন রকম ঢেউ আর লাগে না—শত দুঃখের মধ্যেও সুখ, শত নিরাশার ভিতরেও কেবলই আশা, শত নিরানন্দের ভিতরে একই আনন্দ জাগিয়া আছে।

১৬। তুমি আর আমি।

বন্ধু হে! আসিয়াছ যখন আমার কাছে, তখন আমার দিকে একবার ফিরিয়া দেখ; একবার আমার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া চাও। তুমি হাস, আর আমি হাসি। তোমাকে ভাল বাসিয়া আমার যে কি হইয়াছে তাহা তুমি যদি না বুঝিয়া থাক, তবে আমার তোমাকে বুঝাইবার ক্ষমতা নাই। তোমাকে এইটুকু বলিতে পারি, তোমাকে ভাল বাসিয়া আমি যাহা ছিলাম তাহা আর নাই, যাহা ছিলাম না, তাহাই এখন হইয়াছি—এক কথায় আমি সম্পূর্ণ উল্টাইয়া গিয়াছি। আমি কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্ম করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতাম, কর্ম্মেতেই একমাত্র শান্তি পাইতাম; আর এখন?—এখন ঐ শ্মশানের উপরে কোন্ অজানা সন্ন্যাসীর প্রতিষ্ঠিত মঠে বসিয়াই যেন মহা শান্তি পাই। সন্ন্যাসী দুইশত বৎসরের প্রাচীন জরাজীর্ণ দুইটী বটবৃক্ষের মধ্যস্থলে অবস্থিত মঠে খড়কুটা আনিয়া মাথা গুঁজিবার মত একটুখানি স্থান করিয়া লইয়াছেন। সেটুকুও আছে কি নাই। তাহার চারি পার্শ্বে তোমারই হাতের স্পর্শ পাইবার জন্য দুইচারিটী গাছ বসাইয়াছেন—আর বাকী শুধু ধূ—ধূ—করিতেছে মাঠ, আর মাথার উপরে অনন্ত আকাশ। বন্ধু! এখন আমার মনে হয়—এই রকম নির্জ্জন স্থানই তো তোমার নির্জ্জন সঙ্গলাভের উপযুক্ত স্থান। মনে হয়—দিন রাত—দিন রাত এইপ্রকার নির্জ্জন স্থানে বসিয়া বসিয়া তোমারই সঙ্গে খেলা করি; তোমার চন্দ্রসূর্য্যের, তোমার গ্রহনক্ষত্রের আনন্দগীত শুনিতে থাকি; পাতার মধ্যে ফুলের অন্তরালে তোমারই লুকানো মুখ দেখিয়া ফেলি, আর হাসিয়া কুটিকুটি হই। এখন কর্ম্মেতেই প্রাণের মধ্যে অশান্তি সৃষ্ট করিয়া জ্বলিয়া উঠে, আর অকর্ম্মেই প্রাণের মধ্যে গভীর শান্তি লাভ করি। এই সমস্ত কথা বন্ধু আজ তোমায় বলিতেছি—তুমি হয়তো আমার এই সমস্ত ছেলেমানুষি দেখিয়া কত-না হাসি-

তেছ! কিন্তু বন্ধু! তুমি হাস আর নাই হাস, আমি তো আর আমার প্রাণের যত কিছু কথা—ভাল মন্দ ছোট বড় সমস্ত তোমাকে না বলিয়া থাকিতে পারি না। পূর্ব্বে তোমাকে সমস্ত কথা বলিতে পারিতাম না, অনেক কথা বলিতে লজ্জা আসিত, মনে বাধিয়া যাইত; কিন্তু এখন আর না—তোমার কাছে লজ্জাসরম দূরে ফেলিয়া দিয়াছি—আমার আমিকে আজ তোমার সম্মুখে সম্পূর্ণ মুক্তভাবে দাঁড় করাইয়াছি—তুমি আমার অন্তস্তলের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত দেখ, আর বন্ধু হে! আমি তোমার বুকের মধ্যে ঢুকিয়া যাই। এইটুকু লজ্জাসরম রাখিয়াছিলাম বলিয়া আমি জানি তুমি মধ্যে মধ্যে বিরক্তি দেখাইতে। আজ অবধি তোমার আমার মাঝে কোনই বাধা রহিল না—তুমিও আর আমার উপর বিরক্ত হইতে পারিবে না। আজ আমার সমস্ত পিপাসা দূর হইল; আজ আমার মরমে নিত্য নব নব সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে। আজ হে বন্ধু! হে বন্ধু! তুমি—আর—আমি!

কোন্ বারে কোন্ পঞ্চব্রাহ্মণ আসেন?

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সম্ভত সপ্তম শতাব্দীর শেষে কৌশিকাদিগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আসেন?

আমরা দেখি যে, কোন কোন কুলগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, আদিশূরপত্নী চন্দ্রমুখীর চান্দ্রায়ণ ব্রত সম্পাদনের জন্য পাঁচ গোত্রের পাঁচ ব্রাহ্মণ সমানীত হইয়াছিলেন—সর্ব্বপ্রথমে কোন্ "এক" স্বর্ণকৌশিক ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন; তৎপরে রজতকৌশিক ব্রাহ্মণ সমাহূত হইয়াছিলেন এবং তৎপরে কৌণ্ডিন্য-কৌশিক, ঘৃতকৌশিক এবং কৌশিক আসিয়াছিলেন (১)। উপরোক্ত নামগুলি কোন লোকের নাম নহে, ঐ গুলি গোত্রের নাম (২)। মাত্র চান্দ্রায়ণ ব্রত সম্পাদনের জন্য এরূপ একে একে পাঁচ গোত্রের পাঁচ ব্রাহ্মণ আসা সম্ভব মনে হয় না। আদিশূরের সময়ে ক্ষিতীশ বা ভট্টনারায়ণপ্রমুখ যে পাঁচ পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম কুলগ্রন্থে উল্লিখিত দেখা যায়; কিন্তু স্বর্ণ-কৌশিক প্রভৃতি পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণের আগমন এত সুদূর অতীতে সংঘটিত হইয়াছিল যে, তাহা দুএকটী কুলগ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন কুলগ্রন্থেই উল্লিখিত দেখি না। যে কুলগ্রন্থেও বা ইহার উল্লেখ আছে, তাহাতেও ঐ পঞ্চব্রাহ্মণের নাম উল্লিখিত দেখি না। অনুমান হয়, কুলগ্রন্থ রচনার সময়ে ঐ পঞ্চব্রাহ্মণের নামগুলি বিস্মৃতিসাগরে সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া গিয়াছিল। প্রেমবিলাস প্রকৃতপক্ষে কুলগ্রন্থ নহে, তথাপি গ্রন্থকারের এই সকল পুরাতত্ত্বসম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান ছিল দেখা যায়। একমাত্র প্রেমবিলাস গ্রন্থে ঐ পঞ্চব্রাহ্মণের নাম উল্লিখিত আছে। প্রেমবিলাস বলেন যে, ঐ পঞ্চব্রাহ্মণকে বিদেশ হইতে ডাকা হয় নাই। আদিশূরের রাজ্যেই যেসকল বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলীন দেখিয়া পাঁচটী কৌশিক গোত্রের পাঁচটী ব্রাহ্মণকে ডাকা হইয়াছিল—স্বর্ণকৌশিক গোত্রের ধর্ম্মনারায়ণ, রজতকৌশিকের শিবশঙ্কর, কৌণ্ডিন্যকৌশিকের জনার্দ্দন, ঘৃতকৌশিকের ভুবনেশ্বর এবং কৌশিকের কালিদাস (৩)। কেবল ডাকানো নহে, প্রেমবিলাসের মতে আদিশূর তাঁহাদের দ্বারা একেবারে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করাইলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল না হওয়ায় পত্নী চন্দ্রমুখীর পরামর্শে বৈদিক ক্রিয়াকলাপে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইবার জন্য লোক পাঠান। এই প্রেম-বিলাসেই আবার দেখি যে, ক্ষিতীশ প্রভৃতি যে পঞ্চব্রাহ্মণ "পুত্রেষ্টিযজ্ঞের" নিমিত্ত আনীত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই চন্দ্রমুখীকে চান্দ্রায়ণ ব্রতের দ্বারা সর্ব্বাগ্রে পরিশুদ্ধ করিয়া লইবার পর সপত্নীক রাজার দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন (৪)। এই সকল আলোচনা করিয়া দেখি যে, প্রেমবিলাস

(১) নাম্না চন্দ্রমুখী * * পত্নী * * হ্যাদিশূরস্যচ চান্দ্রায়ণাচারিণী॥
তত্রাদাবাগতঃ কশ্চিদ্ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণকৌশিকঃ।
ততঃ সমাহূতস্তত্র বিপ্রো রজতকৌশিকঃ॥
কৌণ্ডিন্যকৌশিকঃ পশ্চাৎ ঘৃতকৌশিককৌশিকৌ।
এতে পঞ্চ সমাযাতাঃ পঞ্চগোত্রধরাদ্বরাঃ॥
গৌঃ ব্রাঃ দৃত বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা ব্রাঃ কাঃ ৮৩পৃঃ
বঃ সোঃ ৩৩৬-৩৭পৃঃ।

(২) সং নিঃ ৩২১পৃঃ
(৩) প্রেঃ বিঃ ২৪শ বিলাস—২৬১পৃঃ ২য় স্তম্ভ।
(৪) প্রেঃ বিঃ ২৪শ বিলাস—২৬২ পৃঃ ২য় স্তম্ভ।

লোকগুলির নাম প্রভৃতি ঠিকঠাক বলিলেও ঘটনাগুলি উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়া সুন্দর একটী পুরাণ রচনা করিয়াছেন। আমাদের অনুমান হয় যে, সম্বত সপ্তম শতাব্দীর শেষে শূদ্রক রাজার সময়ে সম্ভবত পুত্রেষ্টিযাগ উপলক্ষেই স্বর্ণকৌশিক প্রভৃতি পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। তাই না আদিশূর তাঁহার সভাস্থ ব্রাহ্মণদিগকে সেই পুত্রেষ্টিযজ্ঞ-সম্পাদক সারস্বত ব্রাহ্মণদিগেরই বংশধররূপে সম্বোধন করিয়া তাঁহারও পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। আদিশূরের সময়েও পুত্রেষ্টিযজ্ঞ ও তৎসঙ্গে চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠিত হওয়ায় কোন কোন কুলগ্রন্থকার গোলমাল করিয়া ঐ সারস্বত ব্রাহ্মণদিগের আগমন আদিশূরের সময়ে সংঘটিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণদের আগমন এতই সুদূর অতীতে হইয়াছিল যে, অনেক কুলগ্রন্থের মতে ইহাঁদের বংশধরেরা উত্তরকালে আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণের বংশধরদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল (৫)।

ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ কবে আসেন?

আমরা উপরে দেখিয়া আসিয়াছি যে, সম্বত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি (৯০৯-৯৫৪ সম্বতের মধ্যে) একদল পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন বলিয়া কুলগ্রন্থে উল্লিখিত আছে (৬)। আমাদের অনুমান হয়, ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণই সেই পঞ্চব্রাহ্মণ। মহেশ তাঁহার কুলপঞ্জিকায় ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির আগমনের কথা উল্লেখ করিয়া স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের পিতারাও অর্থাৎ ক্ষিতীশ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণও পূর্ব্বে গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন (৭)। সারাবলী গ্রন্থে মুলোপঞ্চাননধৃত কুলার্ণববচনে আছে ৮৫৪ (৯৫৪?) বৎসরে ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের পুত্র ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন (৮)। এই বচনে "বেদবাণাঙ্কিমে" অর্থাৎ ৮৫৪ বৎসর উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু "বেদবাণগ্রহে" কিম্বা ৯৫৪ বৎসরবাচক শব্দ থাকিলেই সকল দিকে সুসঙ্গতি হয়। সম্বন্ধনির্ণয়কার বলেন যে, দেবীবরের মতে ক্ষিতীশ প্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন (৯); কিন্তু ধ্রুবানন্দাদির মতে, দেবীবরের কারিকাতেও যখন আমরা ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিরও আগমন উল্লিখিত দেখি (১০), তখন আমাদের এই অনুমান অন্যায় হইবে না যে, ক্ষিতীশপ্রমুখ এবং ভট্টনারায়ণপ্রমুখ উভয় দলই গৌড়ে আসিয়াছিলেন, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে। আমাদের বিশ্বাস যে, সম্বত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন আদিশূর চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করিবার পর গৌড়রাজ্য জয় করিয়া অভিষিক্ত হইবার, সুতরাং রাজসূয়সদৃশ কোন এক বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলেন (১১), সেই সময়ে ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। বিপ্রকুলকল্পলতার কারিকায় ৯৯৯ সম্বতে অভিষেকের উল্লেখ আছে। আমাদের কিন্তু অনুমান হয় যে, সম্বত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি ঐ ঘটনা হইয়াছিল। ৯৯৯ সম্বতে যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ হইয়াছিল, তাহা মুলো পঞ্চানন খুব স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন; এবং আমরাও দেখি যে, জনশ্রুতি

(৫) স০ নি০ ৩২১ পৃঃ

(৬) আদিশূরের কালনির্ণয়সম্বন্ধীয় আলোচনায় আমরা যে যে স্থলে যে সময় ধরিয়াছি, সেই সেই স্থলে সেই সেই সময় ধরিয়াই উপরোক্ত কালের উল্লেখ করিলাম।

(৭) অমীষাং পিতরঃ পূর্ব্বাঃ পুরা গৌড়ং সমাগতাঃ।
পিতুর্ব্বরপ্রসাদেন তেঽপি গৌড়ং সমাযযুঃ॥
মহেশের কুলপঞ্জিকা—স০ নি০ ৫০৬পৃঃ

(৮) বেদবাণাঙ্কিমে শাকে বিপ্রাঃ পঞ্চ সমাগতাঃ।
ক্ষিতীশস্তিথিমেধশ্চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ॥ ১
সৌভরিশ্চাপি ধর্ম্মাত্মা পঞ্চদারৈঃ সমন্বিতাঃ।
এতেষাং সূনবো যে তু তেষু পঞ্চ সুকীর্ত্তিতাঃ॥ ২
ভট্টনারায়ণো দক্ষশ্ছান্দড়ো হর্ষ এব চ।
চত্বারো বেদগর্ব্ভেণ পঞ্চ বিখ্যাতকোবিদাঃ॥ ৩
বেদজ্ঞা যজ্ঞনিপুণাঃ প্রেষিতা গৌড়রাজকে।
পুত্রেষ্টিকরণার্থায় পুত্রদারৈঃ সমন্বিতাঃ॥
* * * *
আদিশূরেণ তে সর্ব্বে পূজিতাশ্চ যথাবিধি।
পিতুর্ব্বরপ্রসাদাত্তু তে চ গৌড়ং সমাযযুঃ॥
সারাবলীধৃত কুলার্ণবের বচন—স০ নি০ ৫০৭পৃঃ

(৯) শ্রীক্ষিতীশস্তিথিমেধা বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা আগতো গৌড়মণ্ডলে॥
কুলরমা—স০ নি০ ২৮৪পৃঃ

(১০) শাণ্ডিল্যগোত্রসম্ভূতঃ ভট্টনারায়ণঃ কৃতী।
দেবীবর—ব০ মো০ ২০১

(১১) (ক) বেদষট্‌কশিমানাব্দে শাকে সদ্‌গুণসাগরঃ।
গৌড়রাজাধিরাজঃ সম্ভিষিক্তো মহীপতিঃ॥
বি০ কু০—ব০ মো০ ৩১৮পৃঃ

(খ) রা০ ব্রা০ ৭ পৃঃ পাদটীকা—"প্রবাদ আছে মহারাজ আদিশূর রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনার্থ ইতিপূর্ব্বে (শেষ বারে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনিবার পূর্ব্বে) কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন।

অনুসারে পুত্রেষ্টির পরেই তাঁহার পুত্র জন্মিয়াছিল। আদিশূরের কালনির্ণয়ের আলোচনায় আমরা এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। যে সকল কুলগ্রন্থে ক্ষিতীশ প্রভৃতির আগমন উল্লিখিত দেখি, তাহাদের অনেকগুলিতেই ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিরও, যে সূত্রেই হৌক না কেন, আগমনের কথা উল্লিখিত দেখি। সুতরাং উভয় দলেরই পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে, ধরা অসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে করি না। বিশেষত, ভট্টনারায়ণাদিকে পাঠাইবার জন্য আদিশূরের পত্র এবং বীরসিংহের প্রত্যুত্তর বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত পত্রে "পুনরপি" অর্থাৎ "আবারও" ব্রাহ্মণ পাঠাইবার কথা এবং উক্ত প্রত্যুত্তরে "পূর্ব্বসখ্যের" কথা উল্লিখিত আছে (১২)।

ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণের বঙ্গে আগমন।

আদিশূরের পুত্রেষ্টিযজ্ঞে ক্ষিতীশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন কোন কোন কুলগ্রন্থে উল্লিখিত থাকিলেও অনেকগুলি কুলগ্রন্থেই ভট্টনারায়ণপ্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণেরই আগমন উল্লিখিত হইয়াছে দেখা যায়, এবং ইহার সমর্থক জনশ্রুতিও প্রবলতর দৃষ্ট হয়। ইতিপূর্ব্বে আমরা যে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে আমাদের সিদ্ধান্ত অনেকবার ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি যে, ৯৯৯ সম্বতে আদিশূর কর্ত্তৃক পুত্রেষ্টিযজ্ঞ উপলক্ষেই ভট্টনারায়ণপ্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণ আনীত হন। আমাদের ন্যায় সম্বন্ধনির্ণয়কার ৺লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় (১৩) এবং বল্লালমোহ মুদ্গর প্রণেতা ৺উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ও (১৪) বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনে ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন দেখি। আমরা অবশ্য এমন কথা বলি না যে, আমাদের সিদ্ধান্ত গণিতসিদ্ধান্তের ন্যায় নির্ভুল। আর একটী কথা ইতিপূর্ব্বেই উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, যে সকল কুলগ্রন্থে ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন সমর্থিত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশেই ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিরও আগমন উল্লিখিত হইয়াছে দেখা যায়। যে সকল কুলগ্রন্থকার ক্ষিতীশ প্রভৃতির পর ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিরও আসিবার কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের উক্তি সম্বন্ধে আমাদের এই একটী প্রশ্ন উঠে যে, কুলগ্রন্থে দেখা যায় যে, ক্ষিতীশ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণের ৫৬টী পুত্র জন্মিয়াছিল (১৫), কিন্তু তাঁহাদিগকে গ্রাম দিবার কথা বা তাঁহাদিগের নামে কোন "গাঁই" হইবার কথা উঠে না কেন? ভট্টনারায়ণের পুত্রগণেরই নামে "গাঁই" হয় কেন? ইহাতেই খুব দৃঢ় অনুমান হয় যে, ক্ষিতীশ প্রভৃতি পুত্রেষ্টিযজ্ঞের সময় আসেন নাই, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিই আসিয়াছিলেন। যাঁহাদের মতে ক্ষিতীশ প্রভৃতি পুত্রেষ্টিযজ্ঞে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আরও বলেন যে, তাঁহারা স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় স্ব স্ব পুত্র ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া গৌড়ে ফিরিয়া আসেন (১৬)। কিন্তু কুলগ্রন্থে দেখা যায় যে, সে সময়ে শ্রীহর্ষের বয়স ৯০ বৎসর এবং ভট্টনারায়ণের বয়স ৮০ বৎসর (১৭)। ইঁহারা যদি মেধাতিথি ও ক্ষিতীশের পুত্র হন, তবে তাঁহাদের বয়স অন্তত ১১০ ও ১০০ বৎসরের কাছাকাছি হওয়া উচিত। কিন্তু সে বয়সে গৌড় হইতে তাঁহাদের পক্ষে কান্যকুব্জ ফিরিয়া গিয়া পুনরায় এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন সাধারণত সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু যদি ৯৫৪ সম্বতে ক্ষিতীশ ও মেধাতিথির গৌড়ে আগমন, এবং যজ্ঞান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনও ধরা যায়, তবে তাহা অসঙ্গত হইবার পরিবর্ত্তে সুসঙ্গতই হয়। এইরূপ ধরিলে, ইতিপূর্ব্বে আদিশূর ও বীরসিংহের পরস্পরের মধ্যে যে পত্রব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছি, তাহারও সহিত সুসঙ্গতি রক্ষিত হয়।

(১২) আদিশূরের পত্র—নৃপতিস্বকৃতিসারঃ শ্রীরবংশাবতারঃ প্রবলবলবিচারো বীরসিংহোঽতিধীরঃ। মম বরসখিতাতে ভূমিদেবান্ সতৃত্যান্ পুনরপি মম গৌড়ে প্রাপয় ত্বং নিতান্তং॥

বীরসিংহের প্রত্যুত্তর—মহারাজরাজাদিশূরো মহাত্মা তয়া বীরসিংহস্য মৈত্র্যাদিসখ্যং। তবাজ্ঞানুসারাদ্ধি প্রস্থাপয়ামি দ্বিজান্ পঞ্চগোত্রান্ সদারাদিভৃত্যান্॥ বা॰ ব্রা॰ ৭পৃঃ

(১৩) সম্বন্ধনির্ণয়ে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চ অধ্যায় দেখ—২১০পৃঃ

(১৪) ব॰ মো॰ ৩০৭পৃঃ

(১৫) প্রে॰ বি॰ ২৪শ বিলাস—২৮২ পৃঃ

(১৬) গাঙ্গেয়সদৃশো বৃদ্ধ. শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ। ৫
অশীতিবর্ষদেশীয়ো ভট্টনারায়ণো মুনিঃ। ৬
মহেশধৃত কুলপঞ্জিকার বচন—ধ্রুবানন্দের গোষ্ঠিকথা—স॰ নি॰ ৫৫৫-৫৫৬পৃঃ

ভট্ট বলে শিশু শুন নাম হর্ষ, হাসে পুনঃ
বয়স শতের দশ কম। ৪
আমি ছোট কিংবা বড়, দেখে মন কর দড়
প্রায় অশীতি বয়স মম। ৫
ভাটের কাহিনী—স॰ নি॰ ৫৫৪ পৃঃ

নবজীবন।

(অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ বল, এম-এ)

আমরা সংসারে একলা নই—অনন্ত জীবনের সঙ্গে বাঁধা। আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাস অনন্ত জীবনসাগরে আঘাত করছে। আমার হস্ত-পদ সঞ্চালনে অনন্ত তরঙ্গের উৎপত্তি হচ্ছে। আমি যে কোন কাজ করি তাহার হিসাব অনন্ত ইতিহাসের পাতায় লেখা হচ্ছে। আমার চিন্তা, আমার জ্ঞান কিছুই বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটতে পারে না; সব এক সূত্রে বাঁধা। আমি যদি ভাবি, আমি আছি সংসারে নিজের সুখ-সাধনে,—আমি অর্থোপার্জ্জন করব এবং নিজের লালসার তৃপ্তি করব, কামনা বাসনা চরিতার্থ করব, অপরের কথা একেবারেই আমার মনকে কোনরূপ আন্দোলিত করবে না; সংসারে সবাই নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমি কেন তাহা করব না?—সেটা কি ঠিক? কথাটা একবার তলিয়ে দেখা ভাল। সত্যই কি সংসারে সকলে স্বার্থের পশ্চাতে দৌড়চ্ছে? পিতা খাটছেন সংসারের জন্য—পুত্র-কন্যা সুখে থাকবে বলে; মার চিন্তা সন্তানের সুখ কি করে হয়; তিনি স্বামীর প্রেমে পাগল; তাঁর জীবন সন্তানের জন্য উৎসর্গীকৃত। ত্যাগের চিত্রে সংসার সুন্দর। ইহার বিপরীত কোন ভাব দেখলে আমরা বলি উহা অস্বাভাবিক; আর যখন ত্যাগ শুধু আপনার আত্মীয়গণের জন্য না হয়ে সংসারের সকলের জন্য ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, তখন বলি উহা ঐশ্বরিক। মানুষ যখন এই অবস্থায় গিয়ে পড়ে, তার প্রেম যখন সকলের দুঃখে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, তখন তার জীবন সীমা ছাড়িয়ে অসীমের মধ্যে গিয়ে পড়েছে, মৃত্যুর অন্ধকার পার হয়ে জীবনের আলোকে গিয়েছে। পরের জন্য কিছু করতে পারলে সে সুখী হয়। পর তার পর নয়। সব আপনার।

আমরা যে আপন-পর ভাবি, এর কি কোন মূল্য আছে? ভেদজ্ঞান যতদিন থাকবে ততদিন আমার দিব্য জ্ঞান লাভ হবে না। ততদিন আমি আমার দেহের তৃপ্তিসাধনে ব্যস্ত থাকায়, আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হব, ইন্দ্রিয় আমাকে ক্রীতদাস করে রাখবে। আমাকে দেহের অতীত না করতে পারলে যত ক্রুটী যত অপরাধ আমাকে ঘিরে থাকবে। সংসারে যারা কৃপণ—অর্থলোভ যাদের প্রবল, তারা অর্থ সঞ্চয় করবার জন্য ব্যস্ত। অর্থের যে মোহিনী রূপ তাহা তাহাকে ব্যাকুল করে; অর্থকে সে নিজে সম্ভোগ করে না, অপরকেও সম্ভোগ করতে দেয় না। মৃত্যুর পরে তাহা যক্ষের টাকা হয়ে থাকে; ইহা আমাদের সাধারণের ধারণা। যক্ষ অপরকে সর্ব্বনাশের পথে নিয়ে যায়। আর যার অর্থ জীবসেবা ও দেবসেবায় ব্যয়িত হয়, তার পুণ্য মানুষকে ধর্ম্মের পথে নিয়ে যায়। ভারতের কত মন্দির, কত জলাশয়, কত পান্থশালা, কত ধর্ম্মশালা আজ পুণ্যাত্মাদের স্মৃতি রক্ষা করছে। শুধু তাই নয়, তাঁদের স্মৃতি অপরকে ধর্ম্মভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলছে। তীর্থস্থানে গিয়ে সাধুগণের প্রতিষ্ঠিত মন্দির-পার্শ্বে বসে ভগবদারাধনা করে মানুষ যখন তৃপ্ত হয়, তখন তার সাধনার মধ্যে মন্দির-প্রতিষ্ঠাতার পূত জীবনের প্রভাব এসে পড়ে। যে দেশে এইরূপ পুণ্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেশী, সে দেশের কত গৌরব। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণের পুণ্য কাহিনী যখন আজ-কালকার লোক স্মরণ করে, তাদের জীবনে নূতন ভাব জাগরিত না হয়ে যায় না। যুগের পর যুগ ভগবান আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করছেন, এক জীবনের ধারা অপর জীবনে গিয়ে পড়ছে, এক চিন্তার তরঙ্গ অপর প্রাণকে আঘাত করছে, একের সাধনা অপরকে শুদ্ধ করছে। এই ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের জীবন বিকশিত হচ্ছে। ইহাকেই বলি ভগবানের লীলা।

মানুষ যখন আত্মপর ভেদবুদ্ধি-হারা হয়ে আপনাকে সর্ব্বত্র দেখে, তখন সে আত্মজ্ঞান লাভ করে। তখন সে ত্যাগ করতে ভয় পায় না। ত্যাগেই আনন্দ, ত্যাগেই স্বর্গ। দধীচি মুনি দেবগণের রক্ষার জন্য আপনার অস্থিদান করলেন। আপনার শরীরের সমস্ত শক্তি দেবতাগণের রক্ষার জন্য বজ্ররূপে পরিণত হল। যখনই মানুষের মধ্যে দেবত্ববিনাশের সম্ভাবনা হয়, তখনই দধীচির আত্মা এসে মানুষের মধ্যে বজ্র হয়ে প্রকাশিত হয়। শত শত লোক দেশরক্ষার জন্য অকাতরে

জীবন দান করছেন। শত শত নরনারী পরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। সেখানে কি স্বর্গীয় আনন্দ! আত্মত্যাগ করে তাঁরা আত্মাকে লাভ করেন। ক্ষুদ্র জীবনকে তুচ্ছ করে ভূমা মহৎ জীবনের সৃষ্টি করেন। যাঁরা আপনাকে পরের জন্য করেছেন তাঁদের মৃত্যু নাই; মৃত্যুতে তাঁরা নবজীবন লাভ করেন।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

"যিনি আমাকে সর্ব্বত্র দেখেন এবং আমাতে জীব মাত্রকে দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না; তিনিও আমার অদৃশ্য হন না।"

ভগবানকে দেখবেন সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবে, আর সর্ব্বজীবকে দেখবেন ভগবানে, এই জ্ঞান লাভ করলে ভগবান তাঁকে পরিত্যাগ করেন না, তিনিও ভগবানকে ভুলতে পারেন না। ভগবানকে সর্ব্বত্র অনুভব করতে পারলে প্রকৃত যোগলাভ হয়। সেই যোগ হইতে আর বিচ্যুতি নাই।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥

"হে অর্জ্জুন, যিনি সর্ব্বজীবে সুখ বা দুঃখ আপনার সঙ্গে তুলনায় সমান দেখেন, আমার মতে সেই যোগী শ্রেষ্ঠ।"

আমার যাতে দুঃখ, অপরের তাতে দুঃখ, আমার যাতে সুখ অপরের তাতে সুখ, এই ধারণা বদ্ধমূল হলে পরস্পরের প্রতি হিংসা, ঈর্ষা ও দ্বেষ লোপ পায়। যিশুর জীবনের শিক্ষা—Do unto others as you would be done by. নিজে যেরূপ ব্যবহার পেতে চাও, অপরের প্রতি সেই ব্যবহার কর। এ সব কথা আমাদের কাছে নূতন নয়। বলতে গেলে মানুষের সমাজগঠনের সময় থেকেই এই কথার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ যখন সমাজ গঠন করেছে, তখন সে চেয়েছে সমান ব্যবহার, পরস্পরের প্রতি সমান জ্ঞান। অথচ এই শিক্ষার আবশ্যকতা এখনও কমেনি, এখনও মৈত্রী ও সাম্যের অভাব কম নয়। যত দিন যাচ্ছে ততই যেন সমাজের দুর্গতি হচ্ছে, ততই পরস্পরের প্রতি প্রেম ও ভালবাসার অভাব বেড়ে যাচ্ছে। একদিকে চলছে জীবন-সংগ্রাম। অর্থের অনাটনে মানুষ পিষে যাচ্ছে। সারাদিন খেটেও শরীর রক্ষা করতে পারছে না। আর এক দিকে চলছে ধনীর অর্থ সঞ্চয়। তার অর্থই সর্ব্বস্ব। এই যুগে আবার খৃষ্ট-প্রচারিত ত্যাগ আবশ্যক হয়েছে। গুডফ্রাইডের দিন খৃষ্ট-সমাজের একটী পবিত্র দিন। কথিত আছে, এই দিনে খৃষ্ট মানুষের কাছে তাঁর নবজীবন প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর প্রেমের ধর্ম্মকে তুচ্ছ করে স্বার্থপর অন্ধ মানুষ তাঁকে বলি দিয়েছিল। মনে করেছিল, এই লোকটিকে লোকচক্ষুর অন্তরাল করতে পারলেই তাদের সুবিধা হবে; ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ে ক্ষতি হবে না, ধনীর অর্থলিপ্সায় কোন বাধা পড়বে না; ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র সুখে কালযাপন করবে। সে আশা বৃথা। তবু যিশু বিনা প্রতিবাদে প্রাণদান করলেন, তাঁর একমাত্র কথা "প্রভু ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ এরা কি করছে তা এরা জানে না।" তাঁর এই ক্ষমার কথা প্রাণের মধ্যে বাণের মত বিঁধে যায়। এই প্রেম—এমন কোন কঠিন প্রাণ নাই যাকে আঘাত করে না। তাই তাঁর ক্রুশে বিদ্ধ হবার দিন তিনেক পরে যখন জনসাধারণ ঐ কঠিন আঘাতের বেদনা কিছু সামলিয়ে নিল, তখন তাদের অন্তরে যিশুর প্রেম-ভাব নবতর মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হল। প্রকাণ্ড প্রস্তর অপসারিত হল। কেহই বাধা দিতে পারল না। কোথায় গেল শত্রুর দল। সকলে অবাক হয়ে যিশুগতপ্রাণ হল। যিশু প্রাণ দেওয়ায় তাঁর প্রাণ আজ জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন আর যিশুর বিনাশ নাই। এখন আর কেহ অস্বীকার করবে না যে, যিশু তাঁর পিতার সঙ্গে এক ভাবে সম্বদ্ধ। যিশুর আহ্বান তাই আজ সকলকে ধর্ম্মভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। যিশু যে নবজীবন পেয়েছিলেন, ত্যাগের ফলে আত্মবলিদানের ফলে সেই বার্ত্তা আজ কত নর-নারীকে ঘরের বাহিরে টেনে আনছে। ঐ তাঁরা দুঃখীর সেবা করছেন, আর্ত্তের সেবা করছেন, রোগীর শুশ্রূষা করছেন। মৃত্যুকে তাঁদের ভয় নাই। তাঁরা যাচ্ছেন অজ্ঞাত প্রদেশে, গভীর অরণ্যের মধ্যে, সীমান্তপ্রদেশে অপরিচিত লোকের মাঝে। যিশুর জীবন এসে তাঁদের জীবনে আকার পেয়েছে।

আজকের দিনে বিশেষ করে মনে পড়ছে স্বর্গীয়া পণ্ডিতা রমাবাইয়ের কথা। ভারতের নারী, তাঁরা অবলা বলে পরিচিত। তিনি কি না দেড় হাজার অসহায় বালক বালিকাকে আশ্রয় দিয়ে তাদের মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের জন্য জীবনদান করলেন। পুণার অনতিদূরে কেদগাঁও। সেইখানে দেবী রমাবাইয়ের আশ্রম। সে যে আমাদের পক্ষে পুণ্য ক্ষেত্র। একজন মহিলা সংসারের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে ভগবদুদ্দেশ্যে নরসেবা করে জীবন উৎসর্গ করলেন। ইহা অপেক্ষা পবিত্র দৃশ্য আর কোথায় দেখব? তাঁর মনে যিশুর আদর্শে নবজীবনের সঞ্চার হয়েছিল।

আপনার তরে আসি নাই কেহ
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে,

ইহা কবির কল্পনা নয়। যিশুর ভাবে উদ্বুদ্ধপ্রাণ রমাবাই যা করে গেছেন, সেইরকম অনেকে করেছেন। আজ জগতের ত্যাগী মহাপুরুষগণ সু-উচ্চ আসন থেকে তারস্বরে বলছেন—

স্বার্থ হতে জাগ, দৈন্য হ'তে জাগ, সব জড়তা হ'তে জাগ, জাগরে সতেজ উন্নত শোভাতে!

বাহির কর তব পথের মাঝে, বরণ কর মোরে তোমার কাজে।

নিবিড় আবরণ কর বিমোচন, মুক্ত কর সব তুচ্ছ শোচন,

ধৌত কর মম মুগ্ধ লোচন, তোমার উজ্জ্বল শুভ্র রোচন নবীন নির্ম্মল বিভাতে।

দধীচি এবং যিশু, সক্রেটিস এবং বুদ্ধ সকল মহাজন আত্মবলিদান করে যে নবজীবন লাভ করেছিলেন, তার প্রভাব আজ সব মানুষের জীবনে এসে কাজ করছে। তাঁরা সব ডাকছেন আমাদিগকে ক্ষুদ্রতা ছেড়ে ভূমার মধ্যে গিয়ে পড়তে। আমরা কি তা আজ অনুভব করব না? আমরা কি সামান্য লয়ে সন্তুষ্ট থাকব? প্রাণ ত সামান্য চায় না, প্রাণ চায় অনন্ত প্রাণের সঙ্গে মিলে যেতে। তাই আজ আমরা প্রার্থনা করি, যেন আমাদের দিব্য দৃষ্টি খু'লে যায়, যেন আর সামান্যের পশ্চাতে না দৌড়ই; সমস্ত মোহ মায়া কাটিয়ে ঝাঁপ যেন দিই অনন্ত জীবনসমুদ্রে।

উড়িষ্যায় বাঙ্গালীর উপনিবেশ।

(রায়মহাশয় শ্রীসতীন্দ্রনারায়ণ রায় বি-এল)

উড়িষ্যায় বহু বাঙ্গালীর বাস। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালীগণ উড়িষ্যায় বাস করিতেন। কি কারণে তাঁহারা এদেশে আসিয়াছিলেন তাহা যতদূর সম্ভব নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে সময় পুরীতে বাস করিতেন, সে সময় বহু বাঙ্গালী যাত্রী প্রতিবৎসর শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা দর্শন করিতে আসিতেন। তাঁহারাই স্থানে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। কটক ও পুরী জেলার অনেক গ্রামে বাঙ্গালীপল্লী আছে। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বর্দ্ধমানজেলা হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। সে সময়ে কোন কোন পাঠানশাসনকর্ত্তা হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী ও ঘোর অত্যাচারী ছিলেন। পাঠানের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালীগণ উড়িষ্যায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার জাতি দেখা যায়। কায়স্থ, তিলি, তাম্বুলি, নাপিত, সুবর্ণবণিক ও অন্যান্য নবশাখজাতি বহু পূর্ব্ব হইতে উড়িষ্যার অভ্যন্তরে জমিজমা লইয়া পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয়। যে সকল কায়স্থ বা অন্যান্য জাতি উড়িষ্যায় বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের গুরু বা পুরোহিত তাঁহাদিগের সহিত আসেন নাই। ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে তাঁহাদের বংশধরগণ আজিও সুদূর উড়িষ্যাবাসী শিষ্যের গৃহে পদার্পণ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে উড়িষ্যায় সর্ব্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্য অতিশয় সুলভ ছিল। মাত্র কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেও কটকসহরে টাকায় কুড়ি সের চাউল ও দুই সের বিশুদ্ধ ঘৃত পাওয়া যাইত। তাহার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্য এরূপ সুলভ ছিল যে, এখন তাহা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। এইরূপে সুলভে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ যে দেশে সম্ভবপর ছিল, সে দেশে বাস করিলে স্বধর্ম্মানুরক্তির জন্য কোনও অত্যাচার সহ্য করিতে হইত না। কটক ও পুরী জেলার অধিকাংশ বাঙ্গালী বৈষ্ণবমতাবলম্বী। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সহিত বঙ্গদেশের অন্তরের অন্তর হইতে শ্রীক্ষেত্রের দিকে যে অপূর্ব্ব ভক্তির স্রোত বহিয়াছিল, সেই স্রোতে ভাসিয়া সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালী ঔপনিবেশিক উড়িষ্যায় আসিয়াছিলেন। ইহা বঙ্গদেশের পক্ষে গৌরবের বিষয়।

বিহার ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে রেলওয়ে খুলিবার পর যে সকল বাঙ্গালী সেখানে ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া চিরস্থায়ীরূপে বসবাস করিতেছেন তাঁহাদের ভাষা ও

আচার-ব্যবহারে কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না ; কারণ সর্ব্বদাই বঙ্গদেশের সহিত তাঁহাদের আদান-প্রদান রহিয়াছে। তাঁহাদের প্রায় সকলেরই অবস্থা সচ্ছল। বড় বড় কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রবাসে গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বংশধরগণ আজিও সম্মান ও প্রতিপত্তির সহিত বিদেশে জীবনযাপন করিতেছেন। প্রবাসের মাটির সহিত মিশিয়া জমিজমা লইয়া তদ্দেশীয়দিগের মতই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সুবিধা বা অসুবিধা তাঁহাদের ঘটে নাই। উৎকলপ্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে দুই চারজন মাত্র আজিও মাথা উঁচু করিয়া আছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। রেলওয়ে খুলিবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশের সহিত তাঁহাদিগের সামাজিক আদান-প্রদান ছিল না বলিলেও হয়। এরূপ অবস্থায় মূল সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও তাঁহারা নিজেদের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি যে এখনও বজায় রাখিতে পারিয়াছেন তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। তাঁহাদের ভাষা ও রীতিনীতি সামান্য পরিবর্ত্তিত হইলেও তাহার সহিত এদেশীয় সামাজিক রীতিনীতির কোনও সাদৃশ্য নাই। ভাষা হিসাবে প্রায় সকলেই বাঙ্গালাভাষী ; তবে দুই-এক স্থানে নাপিত, তিলি ও সুবর্ণবণিক প্রভৃতি কতকগুলি বাঙ্গালী ঔপনিবেশিক মাতৃভাষা ভুলিয়া গিয়াছে। উড়িষ্যায় যে সকল বাঙ্গালী বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত বঙ্গবাসিগণ ক্রমশঃ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলে পর রীতিনীতির যে সামান্য বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে তাহাও লোপ পাইয়া যাইবে। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে রীতিনীতি বা ভাষাগত যে পার্থক্য আছে, তাহার অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গের সহিত উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালীদিগের অতি সামান্য পার্থক্যই দেখা যায়।

বালেশ্বর সহরে অনেক তাম্বুলি বাস করেন। বালেশ্বর তাম্বুলি জাতির প্রধান কেন্দ্র। তাঁহারা সকলেই বাঙ্গালাভাষী এবং ক্রিয়াকর্ম্ম আচারব্যবহারে তাঁহাদিগের সহিত বঙ্গদেশীয় তাম্বুলিদিগের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ব্যবসা ব্যপদেশে এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের আদিম বাস বর্দ্ধমান জেলায় ছিল। মোগলশাসনকালে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বালেশ্বরে আসিয়াছিলেন। আজকাল বঙ্গদেশে ব্যবসাবাণিজ্যের যেরূপ অবনতি হইয়াছে তাহা দেখিলে বঙ্গবাসিগণ কোনও দিন ব্যবসাবাণিজ্যের প্রতি আস্থাবান ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। সর্ব্বপ্রথমে দুইটি তাম্বুলি পরিবার বালেশ্বরে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বংশধরগণ প্রায় সহরটির অধিকাংশ দখল করিয়া বসিয়াছেন। বালেশ্বর সে সময়ে একটি প্রধান বন্দর ছিল। তাম্বুলিগণ তাঁহাদের নিজেদের জাহাজে মাল আমদানী ও রপ্তানি করিয়া বিশেষ অর্থশালী হইয়াছিলেন। তাঁহারা যেরূপ দক্ষতা ও কর্ম্মকুশলতার সহিত ব্যবসা চালাইতেন তাহা সমগ্র ভারতবাসীর অনুকরণীয়। তাঁহাদের দেশীয় অর্ণবপোত সমুদ্রবক্ষ ভেদ করিয়া মাদ্রাজ, লঙ্কা এবং পশ্চিম উপকূলের বহুস্থানে যাইত। বিদেশে আসিয়া তাঁহারা পরিশ্রম, সততা এবং অধ্যবসায়ের দ্বারা যে এরূপ বিস্তৃত কারবার গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদিগের কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে। ইংরাজশাসনের প্রারম্ভেও বালেশ্বরের তাম্বুলিগণ তাঁহাদিগের পৈত্রিক ব্যবসা সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াছিলেন। সে সময় বালেশ্বরে পরিষ্কৃত লবণ প্রস্তুত হইত এবং সেই লবণ রপ্তানির অন্যতম পণ্য ছিল। লিভারপুল লবণ অপেক্ষা ঐ লবণ কোনও ক্রমে কম পরিষ্কৃত ছিল না। শৈবালের সহিত সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তুত হইত। অতি সহজ উপায়ে এইরূপ লবণ প্রস্তুত করিবার সুন্দর প্রণালী অন্য কোনও প্রদেশে প্রচলিত ছিল কি না সন্দেহ। আজকাল অবাধ বাণিজ্যের ফলে লিভারপুল লবণ এদেশে যথেষ্ট আসিতেছে। কিন্তু সে সময় পরিষ্কৃত লবণের চাহিদা যথেষ্ট ছিল এবং বালেশ্বরের নিকটস্থ সমুদ্রোপকূলে যে লবণ প্রস্তুত হইত তাহা অন্যান্য স্থানে উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইত। এই লবণের কারবারে বালেশ্বরের তাম্বুলি ব্যবসায়ীগণ বিশেষ লাভবান হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে সমুদ্রের জল মারিয়া এইরূপ লবণ প্রস্তুত করিলে লাভবান হইবার কিরূপ সম্ভাবনা, কিছুদিন পূর্ব্বে সে বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। পূর্ব্ব প্রণালী অবলম্বন করিয়া এখনও পরিষ্কৃত লবণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে যেরূপ অর্থব্যয় হইবে তাহার হিসাব করিলে ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। সে সময়ে সমুদ্রের বিস্তীর্ণ বেলাভূমি অযত্নসম্ভূত বেলাজাতীয় উদ্ভিদে সমাচ্ছন্ন থাকিত। কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে বেনার জ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তুত হইত বলিয়া সস্তা দরে লবণ বিক্রয় করা যাইতে পারিত। এখন সমুদ্রের কূলে এরূপ উদ্ভিদ আর জন্মায় না। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন, বারিপাতের স্বল্পতা বা অন্য কোনও প্রাকৃতিক কারণে এরূপ হইয়া থাকিবে। বালেশ্বরের তাম্বুলিগণ যত দিন ব্যবসাবাণিজ্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তত দিন জমিদারী ক্রয় করেন নাই। পরে ব্যবসায়ে অবনতির সহিত তাঁহারা সঞ্চিত অর্থে জমিদারী ক্রয় করিয়া প্রায় সকলেই ছোটবড় জমিদার হইয়াছেন। রাজা শ্যামানন্দ দে ও তাঁহার পুত্র মহারাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর বালেশ্বরের তাম্বুলিসমাজের অগ্রগণ্য ও নেতাস্বরূপ ছিলেন। বালেশ্বরের তাম্বুলিসমাজের পূর্ব্বশ্রী আর নাই, তবে এখনও তাম্বুলিগণ

বালেশ্বর সহরের প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

একটি কায়স্থপরিবার মোগলদিগের রাজত্বকালে এদেশে আসিয়া বালেশ্বর জেলায় বসবাস করেন। বালির সন্নিকটস্থ উত্তরপাড়া নামকস্থানে তাঁহাদিগের আদিবাস ছিল। তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ মোগলসরকারে চাকলা-কানগোর কার্য্য করিতেন। সে সময়ে তাঁহারা পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে চাকলা-কানগোইর পদ উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ করিতেন। বর্ত্তমান কালের জেলার কলেক্টার অপেক্ষা চাকলা-কানগোইগণ অধিক ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহারা দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাদিগের অনুজ্ঞায় বাধা প্রদান করিবার শক্তি কাহারও ছিল না। মোগলগণ তাঁহাদিগকে 'রায়মহাশয়' উপাধি দিয়াছিলেন। মোগলশাসনের অবসানে মারহাট্টা ও ইংরাজদিগের আমলেও এই পরিবারের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল এবং কানঙ্গোই বা রাজস্বগ্রহীতার পদ তাঁহাদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। ইংরাজরাজত্বে কানঙ্গোইর পদ উঠিয়া যাইবার পর তাঁহারা জমিদার বলিয়া গণ্য হইতেছেন। সে সময়ের সামাজিক রীতি অনুসারে তাঁহারা কন্যাগণের বিবাহ দিয়া জামাতাকে গৃহে রাখিতেন এবং কুলীন জামাতাদিগকে যথেষ্ট জমিজমা দিয়া তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। বালেশ্বর জেলায় অনেক কুলীন কায়স্থই এইরূপে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বংশধরগণ আজিও এই জেলায় বাস করিতেছেন।

ইংরাজশাসনের প্রারম্ভে রাজস্ব বাকীর নিলাম কলিকাতার 'বোর্ড অব্ রেভিনিউ'এ হইত এবং নিলামী ইস্তাহার ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইত। উড়িষ্যার জমিদারগণ সে সময়ে সূর্য্যাস্ত আইনের মর্ম্ম সবিশেষ অবগত ছিলেন না। অনেক স্থলে রাজস্ব বাকী পড়িয়াছে কি না তাঁহারা জানিতেও পারিতেন না। এই কারণেই বড় বড় জমিদারী বিক্রয় হইয়া যাইতে লাগিল এবং কলিকাতার ধনিগণ উড়িষ্যার বড় বড় তালুক খরিদ করিতে লাগিলেন। পরে রাজস্ব আইন সংশোধিত হয় এবং কলিকাতায় নিলামী ইস্তাহার জারীর কুপ্রথা রহিত হয়। এই বিসদৃশ রাজস্ব আইনের অবিধেয় প্রয়োগে উড়িষ্যার অধিকাংশ জমিদারী বঙ্গবাসীর হস্তে চলিয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা সকলেই প্রবাসী। তাঁহাদিগের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক জমিদারই তাঁহাদের প্রজার প্রকৃত অবস্থা অবগত আছেন। নায়েব গোমস্তা প্রভৃতির দ্বারা তাঁহারা জমিদারী চালাইয়া থাকেন এবং প্রজার সুখ-দুঃখ বা উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালীর কথা তাঁহারা কিছুই জানেন না। এরূপ অবস্থায় উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালীগণ বাঙ্গালী জমিদারের প্রজাস্বরূপ বসবাস করিয়াও তাঁহাদিগের অভাব-অভিযোগের কথা জমিদার সমীপে সুবিধামত জানাইতে পারেন না। বঙ্গের বড় বড় জমিদারগণ যদি উড়িষ্যাপ্রবাসী বাঙ্গালীর সুখ দুঃখের কথা জানিয়া তাঁহাদের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টি দান করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের অনেক উপকার হইত। অস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে রাজস্ব যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে উড়িষ্যায় জমিদারী ক্রয় করা অনেকস্থলে বিড়ম্বনা মাত্র হইবে। এরূপ অবস্থায় ভবিষ্যতে বাঙ্গালী জমিদারের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইবে। বড় বড় জমিদারী ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া আবার এতদ্দেশবাসীর হস্তেই ফিরিয়া যাইতেছে। উড়িষ্যাপ্রবাসী বাঙ্গালীর অবস্থা সচ্ছল নহে। তাঁহাদের মধ্যে এমন খুব কমলোকই আছেন যাঁহারা বঙ্গবাসী জমিদারদিগের সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালীদিগের প্রতিপত্তি ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে।

বর্দ্ধিষ্ণু জাতির পক্ষে প্রসারণের স্থান আবশ্যক। পূর্ব্বে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর বাংলার ছোটলাটের অধীনে ছিল। বাঙ্গালার কৃতবিদ্য ছাত্রগণ চাকরী পাইয়া এই সমস্ত স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। অস্বাস্থ্যকর, মেলেরিয়াক্লিষ্ট জেলাসমূহে তাঁহাদিগকে পর্য্যায়ক্রমে বদলি হইতে হইত না। ছোটনাগপুরের খনিসমূহের পরিচালনায়ও অনেক বাঙ্গালী নিযুক্ত হইতেন। বাংলাদেশের সহিত ছোটনাগপুর একশাসনাধীন ছিল বলিয়াই অনেক বাঙ্গালী ধনী ছোটনাগপুরের কয়লা এবং লোহের খনির মালিক হইয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গের সময়েও পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সংপ্রসারণ স্থানের অভাব ছিল না। বঙ্গভঙ্গ রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আসাম বিহার ও ছোটনাগপুর বঙ্গদেশে হইতে বিচ্ছিন্ন হইল এবং বঙ্গদেশের বাহিরে বাঙ্গালীর আর স্থান রহিল না। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে যে সকল বাঙ্গালী চিরস্থায়ীরূপে বাস করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে সরকারী চাকরী পাওয়াও দুর্ঘট হইয়াছে। উড়িষ্যা ও বিহার প্রদেশের অধিবাসিগণ বাঙ্গালীর প্রাধান্য মানিয়া লইতে ইচ্ছুক নহেন। বর্ত্তমান সভ্যতার আলোক ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্রই বিকীর্ণ হইতেছে। শিক্ষার প্রচারের সহিত বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের অধিবাসীগণ সরকারের নিকট হইতে তাঁহাদিগের পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া লইতে শিখিয়াছেন। এতকাল তাঁহারা বাঙ্গালীদিগের প্রাধান্য মানিয়া লইয়াছিলেন। এখন বাঙ্গালীবিদ্বেষ তাঁহাদের অন্তরে জাগ্রত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের পক্ষে সরকারী চাকরী পাওয়া সুকঠিন। ওকালতী ব্যপদেশে

অনেক বাঙ্গালী বিহার-উড়িষ্যায় আসিতেন। এখন দিন দিন এদেশীয় উকীলদিগের সংখ্যা বাড়িতেছে; সুতরাং সাধারণ রকমের বাঙ্গালী উকীলের এদেশে আর স্থান নাই বলিলেও হয়। এরূপ অবস্থায় প্রবাসী বাঙ্গালীর ইতিকর্ত্তব্য কি তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। মাড়োয়ারীগণ সুদূর রাজপুতানা হইতে আসিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া উড়িষ্যা হইতে অপরিসীম অর্থ লইয়া যাইতেছেন। প্রবাসী বাঙ্গালীগণ চাকরী বা ওকালতীর মোহ ছাড়িয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করিলে তাঁহাদের দুর্দ্দশার অবসান হইবে। বঙ্গের ভিতরে এবং বঙ্গের বাহিরে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পক্ষে একই সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে। জীবনসংগ্রামে পশ্চাৎপদ না হইয়া বিক্রম ও শৌর্য্যের সহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। গতানুগতিকের পন্থা ছাড়িয়া মস্তিষ্ক চালনা দ্বারা অর্থাগমের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। মাড়োয়ারীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আত্মনির্ভর, স্বাবলম্বন ও সঙ্ঘবদ্ধ হইবার শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রবাসী বাঙ্গালীর দুঃখ ও দৈন্য—দুর্দ্দশা ও দুর্গতির তিরোধান হইবে। সুষুপ্তির মোহ ছাড়িয়া কর্ম্মশক্তিকে সবল ও চঞ্চল করিতে হইবে। প্রতিভার ক্ষণপ্রভালোকে আমাদের আস্থা স্থাপন না করিয়া অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। মুষ্টিমেয় প্রবাসীবাঙ্গালী সঙ্ঘবদ্ধ হইলে এখনও অসাধ্য সাধন করিতে পারে। সহানুভূতি উদারতা দয়া প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের গুণনিচয় যাহাতে সমাজে পরিস্ফুট হইতে পারে তাহার দিকে সকলকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। স্বার্থপরতার সংকীর্ণ গণ্ডীতে থাকিয়া তৃপ্তিলাভ করিলে কোনও সমাজের কল্যাণ-সাধন হইতে পারে না। বর্ত্তমান বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর সহিত সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে না পারিলে প্রবাসী বাঙ্গালীর উদ্ধারের উপায় নাই। জীবনসংগ্রামে পরাস্ত হইয়া ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হওয়া অপেক্ষা সর্ব্বস্বপণ করিয়া জাতি ও সমাজের কল্যাণসাধন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা গৌরবের বিষয়। 'মন্ত্রের সাধন বা শরীরপতন' এই মহাবাক্যকে আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব করিতে হইবে।

সমাজ, রাষ্ট্র ও সাহিত্যে নবগঠনের যুগ আসিয়াছে। পুরাতনকে বিসর্জ্জন দিয়া নূতনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। অক্লান্তকর্ম্মী নবযুগের পুরোহিত আবশ্যক। প্রবাসী বাঙ্গালীগণ যদি চরিত্রবল, প্রতিভা ও সততার দ্বারা সেই স্থান অধিকার করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের জীবন সার্থক হইবে এবং উড়িষ্যায় বাঙ্গালীদিগের প্রভাবও অক্ষুণ্ণ রহিবে। আশার বিষয়, স্বর্গীয় রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর উৎকলসাহিত্যে নবভাব ও নবপ্রেরণা দান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। বঙ্গ-সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদনের যে স্থান, উৎকল-সাহিত্যে রাধানাথ রায়েরও সেই স্থান। উভয়েই নবযুগের পুরোহিত। উভয়েই নবযুগের পদ্য ও কাব্যের প্রতিষ্ঠাতা। রাধানাথ রায়ের স্মৃতি উৎকলবাসীর কৃতজ্ঞ হৃদয়ে চিরকালই সমাদৃত হইবে। একজন প্রবাসী বাঙ্গালী উৎকলসাহিত্যের প্রাণদান করিয়াছেন। নবভাবে ভাবিত হইয়া নব উন্মাদনায় প্রবাসী বাঙ্গালীগণ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করুন। উৎকলবাসীর সুখ-দুঃখে তাঁহাদিগের হৃদয় স্পন্দিত হউক। তাঁহাদিগের দুঃখদৈন্য দূর করিতে তাঁহারা দৃঢ়সংকল্প হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউন। তাঁহাদের স্বার্থত্যাগে বাঙ্গালীর নাম গৌরবান্বিত হইবে।

গান।

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

দেশ—একতালা।

(আমার) বেদন-ভরা আঁখির কোণে
অশ্রু যদিই ঝরে।
(তখন) তুমিই এসে মুছিয়ে দেবে
তোমার আপন করে॥
আসবে পথে শতেক বাধা—কাঁপবে হিয়া গুরু,
তাই বলে কি যাত্রা আমার আজ হবে না সুরু?
পথের সাথী হারিয়ে যাবে, হয়তো আমায় কাঁদতে হবে
ভরসা দিতে কেউ না রবে, বিজন বনের ধারে—
(তখন) তুমিই আমার সঙ্গে যাবে সুগম সুপথ ধরে॥
ক্লান্তি এসে অলসবেশে হরবে আমার মন,
হয়তো ভীতি করবে আমায় পথেই অচেতন।
তাই বলে কি অসাড় প্রাণে রইব বসে আপন মনে?
পারব না তা—ছুটবো আমি আকুল আবেগ ভরে—
দেখবো তুমি দাও কি না দাও আসতে তোমার ঘরে॥

এমিয়েলের জার্নাল।

(শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায় কর্তৃক অনূদিত)

কোন অতলস্পর্শ গহ্বর মস্তিষ্কপ্রদেশে ঘূর্ণনের সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে যেরূপ তদভ্যন্তরাভিমুখে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ প্রত্যেক অহিতকর রিপুর দ্বারাই আমরা তৎপ্রতি সবলে আকৃষ্ট হইয়া থাকি। চিত্তের দুর্ব্বলতাই মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতার কারণ; এবং রুদ্র রিপু গহ্বর ইহার স্বাভাবিক ভীষণতা সত্ত্বেও পরম আশ্রয়স্থলরূপে আমাদিগকে তৎপ্রতি প্রলুব্ধ করে। মনুষ্যের কি ভয়ঙ্কর বিপদ-

সকুল অবস্থাই না—কেন না, আমাদিগের হৃদয়মধ্যেই এই অনতিক্রমণীয় গহ্বর বিদ্যমান। এই সর্ব্বগ্রাসী গহ্বর আমাদিগের সুগভীর প্রদেশে বিরাজিত থাকিয়া নারকীয় বিষধর সর্পের ন্যায় সুবিপুল করাল মুখ ব্যাদান-পূর্ব্বক আমাদিগকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছে। আমাদিগের আত্মশক্তির স্বাধীনতা এই গহ্বরের উপরি-ভাগে ভাসমান থাকায় এই করাল গহ্বর উহাকে গ্রাস করিয়া অতলতলে লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বক্ষণ সচেষ্ট রহিয়াছে। বিবেক নামক আমাদের কেন্দ্রীভূত আন্ত-রিক শক্তিনিচয়ের সমষ্টিই আমাদিগের একমাত্র রক্ষা-কবচ। এই বিবেকের অগ্নিশিখা ক্ষুদ্র হইলেও অনি-র্ব্বাপ্য; ইহারই জ্যোতি কর্ত্তব্য, ইহারই উত্তাপ প্রেম। এই ক্ষুদ্র অগ্নিশিখাই আমাদের জীবনের ধ্রুব নক্ষত্র। ক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্রতরঙ্গে আন্দোলিত জীবনতরণীর ইহাই একমাত্র কর্ণধার। সংসারসমুদ্রের মহা প্লাবন শক্তি ও অজ্ঞানান্ধকার সম্ভূত কলুষ কুম্ভীর-হাঙ্গর-মকরাদি জল জন্তুর এবং ঝঞ্ঝা-ঝটিকা প্রভৃতির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে এই বিবেক-বহ্নিশিখাই কেবল মাত্র সক্ষম। পবিত্র কারুণিক পরম পিতা যিনি, তাঁহারই উপর যে অটল বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসই স্বর্গীয় নিষ্কলঙ্ক শুভ্র জ্যোতি-রংশ। সেই জ্যোতি হইতেই এই বিবেকাগ্নি প্রজ্বলিত।

ভয় চকিত আদিম জাতিসমূহের মধ্যে যে প্রগাঢ় ও ভীতিপূর্ণ কবিত্ব বর্ত্তমান তাহা কত গভীর ভাবেই না আমার চিত্তকে অধীর করে। সেই আদিম সন্ত্রাসরাশি হই-তেই জগতের বিভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টিতত্ত্ব ও দেব-শাস্ত্রের উদ্ভব। আমি আমার দ্বন্দ্বহীন চিত্তে পূর্ণরূপে অনুভব করিতেছি যে, বিভিন্ন ধর্ম্ম-ইতিহাস এক অপরিবর্ত্তনীয় ভূমা চিন্তারই নিদর্শন—ব্রহ্মাণ্ডের মূলে বিশ্বপতি-বিষয়ক চিন্তা। আমার অন্তরের গভীরতম অনুভূতির মধ্যে সকল সৃষ্টিতত্ত্বের মহা অনৈক্যের মধ্যে এক অত্যাশ্চর্য্য বিরাট ঐক্য বর্ত্তমান। সর্ব্বলোকে সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থ যে মহান উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করে, অনন্ত সঙ্গীতের সুরসংযোগে যে ঐক্যতান সঙ্গীত রচনা করে, আমি এই নিখিলব্যাপী অনৈক্যের মধ্য দিয়া সেই ঐক্যতানই শ্রবণ করি। পাতাল-তলের নরকপুরীর অন্ধকারের বিভিন্ন স্তরগুলিকে অতিক্রম করিয়া আমি যেন ঊর্দ্ধে শুভ্র জ্যোতির্লোকে আরোহণ করিতেছি। ভীষণ নরক উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গপ্রাপ্তিতেই আমার গতির পরিসমাপ্তি। প্রেতলোক, মর্ত্ত্যলোক, স্বর্গলোক—এই ত্রিলোকই আমাদের অভ্যন্তরে। মনুষ্যই সেই প্রকাণ্ড ত্রিলোকব্যাপী গভীর গহ্বর।

জিনেভা—২০শে মে, ১৮৫৫।

আল্‌পস্‌ পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে আমি শিশুর প্রায় হই—শিশুসুলভচপলতা ও নবীনতা আমার চিত্তে উদয় হয়। বয়সের গুরুভার, কর্ম্মক্ষেত্রের বিধি-ব্যবস্থা, জীব-নের ক্লেশকর ও পরিহাসযোগ্য সতর্কতা দূরে পরিহার-পূর্ব্বক আমি পরমানন্দের পূর্ণ জোয়ার স্রোতে ঝম্প প্রদান করি; এবং ভবিষ্যৎ চিন্তারহিত হইয়া উপস্থিত আমোদ-ক্রীড়ায় মত্ত হই। চিন্তাশূন্য লঘুচিত্ততার মধ্যে আমার দৈনিক শৃঙ্খলাবদ্ধ অভ্যস্ত কর্ম্মাবলী আমি এরূপ আশ্চর্য্য ভাবে বিস্মৃত হই যে, আমি যে একজন নগরের কর্ম্মী অথবা অধ্যাপক অথবা পণ্ডিত এ সমস্ত কিছুই অনুভব করিতে পারি না—আমার অতীত আমার নিকট স্বপ্ন বলিয়া প্রতীত হয়। এ যেন বিস্মৃতি সাগরে অবগাহন।

যখন আমি প্রত্যক্ষ করি যে কত অনায়াসে আমি আমার অতীত জীবন বিস্মৃত হইয়া সদ্যোজাত নির্ম্মলচিত্ত শিশুর অবস্থায় উপনীত হই, তখন মনে হয় যে অতি সামান্য অসুস্থতা আমার ক্ষণভঙ্গুর স্মৃতিশক্তিকে বিনষ্ট করিয়া আমার অতীত সত্তার বিলোপ করিতে পারে। জীবন এমনই আমার নিকট স্বপ্নতুল্য প্রতীত হয় যে, আমি মুমূর্ষু ব্যক্তির অবস্থায় আপনাকে অতি সহজেই স্থাপন করিতে পারি, যে মুমূর্ষু ব্যক্তির নেত্রসম্মুখে দৃশ্যমান জগত এবং বস্তুনিচয়ের বিসম্বাদ ধীরে ধীরে নাস্তিতে লোপ পায়। তরল পদার্থের ন্যায়, বাষ্পের ন্যায়, মেঘের ন্যায় আমি বিভিন্নরূপী—আমি কেবলই রূপ হইতে রূপান্তরে অতি সহজেই গমনাগমন করিয়া থাকি। সমুদ্র-তরঙ্গের উত্থান-পতনের ন্যায় আমার চিত্ত মধ্যে কত কি ভাবলহরীর উদয় ও বিলীন হয়। যখন আমি বলি কেবলই রূপান্তরিত হইতেছি, সেই রূপান্তর আমার জীব-নের যাহা কিছু উপরিভাগে রহিয়াছে তাহারই রূপান্তর—ভিতরের অন্য আমির নহে। কারণ আমি অনুভব করি আমার আত্মার যাহা কিছু—আমার গভীরতম প্রেম, আমার অনন্ত উন্নতির আশা, এ সমুদায় কোন রূপের ঘূর্ণীপাকের মধ্যে গিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে না। সীমাবদ্ধ পদার্থই কেবল মরণশীল এবং তাহারাই রূপান্তরিত হয়। মৃত্যুশয্যায় মানবমাত্রই ইহা অন্তরের অন্তরে অনুভব করিয়া থাকেন। আমি সারা জীবন ধরিয়া ইহা অনুভব করিয়া আসিতেছি, এবং এই নিরবচ্ছিন্ন অনুভূতিতেই অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে আমার পার্থক্য। প্রেম ব্যতীত, চিন্তা ব্যতীত, স্বাধীনতা ব্যতীত প্রায় অন্য সমস্ত বস্তু সম্বন্ধেই আমি উদাসীন; এবং যে সমুদায় পদার্থ অধি-কাংশ লোকের মনকে সবলে আকৃষ্ট করে, আমার চিত্ত তাহারা কেবলমাত্র কৌতূহলের উদ্রেক করে। ইহার তাৎপর্য্য কি?—ইহা কি আমার নির্লিপ্ততা বা আসক্তি-হীনতা বা দুর্ব্বলতা বা প্রাজ্ঞতা?

জিনেভা—জুলাই, ১৮৬০।

সর্ব্বনাশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

(শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি. এস্-সি)

১। দেশের হাওয়া।

আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে গত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত "রঙ্গালয় ও দেশোন্নতি"-শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা বঙ্গীয়সমাজের আসন্ন সর্ব্বনাশের সোপান নৃত্যের বিরুদ্ধে দেশের চিন্তাশীল মনীষিগণের ও বাংলার যুবকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার যে চেষ্টা করিয়াছি তাহা ব্যর্থ হয় নাই। সঞ্জীবনী তো ইহার প্রতিরোধের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি তত্ত্বকৌমুদীর সুপ্রবীণ সম্পাদক মহাশয়ও এই বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া উক্ত প্রবন্ধটী উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করায় আমাদের কর্ত্তব্যভার অনেকটা লঘু হইয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। ঢাকা হইতে প্রকাশিত ঢাকাপ্রকাশের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়ও সম্প্রতি ধর্ম্মের আবরণে অনুষ্ঠিত এইরূপ নৃত্য-আয়োজনের সুতীব্র প্রতিবাদ করিয়া সমগ্র দেশহিতৈষী ব্যক্তির ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। বরিশালের পটুয়াখালিতে স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ও ছাত্রবৃন্দের বিশেষ আপত্তির ফলে ধর্ম্মের ছদ্মবেশে নৃত্য-আয়োজনের চেষ্টা বিফল হয়। ইহাঁদের সৎসাহস বিশেষরূপে প্রশংসনীয়। আশা করি অন্যান্য স্থানের শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়ও ইহাঁদের সৎপ্রচেষ্টার অনুকরণ করিবেন।

এই সকল দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা যায় যে, দেশের হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে। স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কতকগুলি তথাকথিত নেতা দুর্নীতির পঙ্কিল পথ নৃত্যাদিকে উন্নতির পথ বলিয়া সহস্র চীৎকার করিলেও বাংলাদেশ তাহা স্বীকার করে না। এই মুষ্টিমেয় নেতৃগণের কলকোলাহলে সুনীতির সুগম্ভীর স্বর কিয়ৎকালের জন্য ডুবিয়া যাইলেও তাহা থামিয়া যায় নাই। এবং আমরা বেশ অনুভব করিতেছি যে দুর্নীতির কোলাহলকে স্তব্ধ করিয়া পুনরায় সেই স্বর উচ্চ হইতে উচ্চগ্রামে উঠিতেছে। যে সকল সম্পাদক ও যুবকবৃন্দ এখনও দেশের এই সুমঙ্গল ধ্বনিতে যোগ দান করেন নাই, তাঁহাদিগকে আমাদের সানুনয় অনুরোধ এই যে, দেশকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহারা অবিলম্বে ইহাতে যোগদান করুন। দেশ নীরবে তাঁহাদের মুখের দিকে দেখিতেছে। যে পাপের ফলে প্রাচীন গ্রীস, রোম আদি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সুবিখ্যাত রাজ্যসমূহ ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গিয়াছে, আমাদের প্রিয় জন্মভূমিকে বাঁচাইবার জন্যই অবিলম্বে সেই পাপের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে, সভায়, সমিতিতে—এক কথায় সর্ব্বত্রই সংগ্রামে অবতীর্ণ হউন। এই মুহূর্ত্ত হইতেই সকল সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ স্বীয় পাঠকদিগকে এই বিপদের বিষয়ে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিন, ইহার ভীষণ পরিণাম বুঝাইয়া দিন। গ্রাহকহানির ভয়ে অথবা মুষ্টিমেয় লোকের অপ্রিয় হইবার ভয়ে দেশের সর্ব্বনাশকে প্রশ্রয় দিলে, যে জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও গরীয়সী তাঁহার প্রতি কৃতঘ্নতাই প্রকাশ পাইবে।

২। রঙ্গালয় ও অন্নসমস্যা।

অনেকে আমাদের নিকট অনুযোগ করিয়াছেন যে "রঙ্গালয় ও দেশোন্নতি" প্রবন্ধে আমরা রঙ্গালয় যে দেশের অন্নসমস্যার সমাধান করে সে দিকটা লক্ষ্য করি নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা বিশ্বাস করি না যে রঙ্গালয় দেশের অন্নসমস্যার কিঞ্চিন্মাত্রও সমাধান করে এবং সেই জন্যই আমরা ঐ বিষয়ে নীরব ছিলাম।

রঙ্গালয় কি সত্যই দেশের অন্নসমস্যার সমাধান করে, না, ঐ সমস্যা আরও বৃদ্ধি করে? ইহা সত্য যে, রঙ্গালয়ের ফলে দুইচারজনের—যথা অধিকারী, গ্রন্থকর্ত্তা, অভিনেতৃবর্গ প্রভৃতির—অন্নসমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান হয়; কিন্তু ইহাও কি ঠিক্ নহে যে, সেই সঙ্গেই আরও সহস্র সহস্র দেশবাসীর—যাহারা দর্শকরূপে উপস্থিত থাকে তাহাদের অন্নসমস্যা বৃদ্ধিই পায়? বাংলা রঙ্গালয়ের দর্শকগণের সাংসারিক অবস্থার অনুসন্ধান করিলে অধিকাংশ স্থলেই কি দেখা যায় না যে, তাহারা হয় পঁচিশ টাকার কেরাণী বাবু অথবা অধ্যয়নার্থী ছাত্র? সেই ছাত্রের পিতা হয় তো প্রাণপণ করিয়া পুত্রের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন—এদিকে কিন্তু পুত্ররত্ন হয় তো নিয়মিত রঙ্গালয় গমনাদির দ্বারা পিতার কষ্টোপার্জ্জিত সেই অর্থের সদ্ব্যয় করিতেছে! যদি সহস্র দেশবাসীর হাহাকার সত্ত্বেও দুই চারি জনের ধনবৃদ্ধিকেই দেশের অন্নসমস্যার সমাধান বলা যায় তাহা হইলে অবশ্যই মানিতে হইবে যে রঙ্গালয় অন্নসমস্যার সমাধান করে। ধনবৃদ্ধিই বা হয় কি প্রকারে? রঙ্গালয়ের দ্বারা বাহির হইতে কোন টাকা ঘরে আসিতেছে না; দেশবাসীর একজনের টাকা অপর জনে প্রকারান্তরে লুণ্ঠন করিয়া লইতেছে মাত্র। রঙ্গালয়ের দ্বারা দেশের অন্নসমস্যার সমাধান হয় বলিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মদ্যাদি নেশার দ্রব্য বিক্রয় রঙ্গালয় অপেক্ষাও শীঘ্র অন্নসমস্যার সমাধান করিতে পারে, কারণ মদ্যবিক্রয়ের ফলে মাতাল যদিও দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়ে কিন্তু মদ্যবিক্রেতা তো ক্রমশই ধনী হইতে আরও ধনী হইতে থাকে। ইহাতেই বেশ বোঝা যায় যে রঙ্গালয়ের সমর্থকগণের এই যুক্তিটি কিরূপ সারগর্ভ!! শুধু তাহাই নহে—আমাদের বিশ্বাস

যে, সাধারণত রঙ্গালয়ের অধিকারীর যেরূপ ব্যবসায়-বুদ্ধি দেখা যায়—যেরূপ সংগঠনী শক্তি দেখা যায়, তাহাতে তিনি ইচ্ছা করিলে দেশের হিতকর অন্য যে কোন ব্যবসায়েই সফল হইতে পারিতেন। ফলে তাঁহার নিজের অন্নসমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গেই দেশেরও অশেষ মঙ্গল হইতে পারিত। তাহা না করায় তিনি স্বীয় প্রতিভার অপব্যয় ও দেশের বিশেষ অনিষ্ট করিতেছেন বলা যাইতে পারে বোধ হয়। তদ্রূপ, যে সকল প্রতিভাশালী অভিনেতৃবর্গ রঙ্গালয়ে আপনার প্রতিভার অপব্যয় করেন—তাঁহারা যেরূপ যত্নের সহিত অভিনয়-বিদ্যা শিক্ষা করেন, সেইরূপ যত্নের সহিত অন্য যে কোন বিদ্যা শিক্ষা করিলে নিশ্চয়ই স্বদেশের জ্ঞানভাণ্ডার কিয়ৎপরিমাণেও বিস্তৃত করিতে পারিতেন এবং তাঁহারা অনুরূপ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিলে, প্রতিভার সদ্ব্যয় করিলে নিশ্চয়ই দেশের মঙ্গলজনক অন্য উপায়েও অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন।

৩। রঙ্গালয় ও বিপথগামিনীগণের উন্নয়ন।

অনেকে ইহাও বলেন যে রঙ্গালয় স্থাপন বিপথ-গামিনীগণের উন্নতিসাধনের উপায়—বিপথগামিনীগণের উন্নয়ন কি ভাল কাজ নহে?

বিপথগামিনীগণের উন্নয়ন ভালকাজগুলির অন্যতম, সন্দেহ নাই। কিন্তু রঙ্গালয় স্থাপনের ফলে কি সত্যই বিপথগামিনীগণের উন্নতি হইয়াছে? উন্নতির লক্ষণ কি? যদি দেখি পথভ্রষ্টাগণ পাপকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দেশের হিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেছে, তাহা হইলে তাহাদের উন্নতি হইতেছে স্বীকার করিতেই হইবে, কিন্তু যদি দেখি যে, পাপকার্য্য পরিত্যাগ না করিয়াই বিপথ-গামিনীগণ দেশের হিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেছে, তাহা হইলে প্রশ্ন আসে যে, দেশের হিত করাই তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য অথবা স্বীয় উপার্জ্জনের পন্থা বিস্তার করাই স্বীয় উদ্দেশ্য? কারণ যাহার এরূপ সামান্য মনের বল নাই যে, দেশের ধ্বংসের কারণ যে পাপ তাহা পরিত্যাগ করে, সে যে দেশের হিতকর কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিবার উপযোগী মনের শক্তি সংগ্রহ করিতে পারিবে তাহা বিশ্বাস হয় না। সুতরাং স্বভাবতই সন্দেহ হয় যে, দেশের হিত করা বাহ্য উদ্দেশ্য হইলেও হয় তো উহার অভ্যন্তরে অন্য গূঢ় উদ্দেশ্য লুকাইয়া আছে।

যাঁহারা বলেন রঙ্গালয় স্থাপনের ফলে পথবিচ্যুতাগণ ভদ্রসমাজের সহিত মিশিবার কারণে উন্নতি করিবার সুযোগ পায় তাঁহারা ভ্রান্ত। প্রথমতঃ ভদ্রসমাজ সময়ে সময়ে অভিনয় দেখিলেও অভিনেত্রীগণকে সাধারণতঃ ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। ইহা ন্যায় কি অন্যায়, সে বিচার আমরা করিতেছি না—কিন্তু যাহা ঘটিয়া থাকে আমরা তাহাই বলিতেছি মাত্র। আর যাঁহারা অভি-নেত্রীগণকে "জাতে উঠাইবার" জন্য উদারভাবে মেলা-মেশা করিতে থাকেন, সেরূপ স্থলে দুই একটি ভিন্ন সকল ক্ষেত্রে প্রায়ই অভিনেত্রীগণের উন্নতির পরিবর্ত্তে সেই সকল উদারভাবভাবীগণেরই পতন হইতে দেখা যায়।

যদি পথভ্রষ্টাগণকে উন্নতির পথে উঠানই প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তবে কি রঙ্গালয়ের ন্যায় পিচ্ছিল পথ—যে পথে প্রতি পদে পদস্খলনের সম্ভাবনা—সে পথ ভিন্ন কি অন্য পথ নাই? যে অর্থে সুবৃহৎ রঙ্গালয় স্থাপন করা হয় সেই অর্থেই তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ও জ্ঞান শিক্ষার জন্য বিবিধ জ্ঞানকরী ও কার্য্যকরী বিদ্যার বিদ্যা-লয় স্থাপন করা হউক না কেন? যে সকল "উদার"মনা রঙ্গমঞ্চে ইহাদের সহিত মিশিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না, তাঁহারাই এই সকল বিদ্যালয় পরিচালনা করুন না কেন? তাহা না করিয়া, তাহাদিগকে ভদ্রসমাজ মধ্যে লালসার ইন্ধন যোগাইবার সুযোগ দিলেই কি তাহাদের উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করা হইল বলিতে হইবে? ইহাতে তাহাদের উন্নতি যত না হউক, ভদ্রসমাজের যে পতনের সম্ভাবনা আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঢাকায় ব্রাহ্মবিবাহ।

গত ২৮শে শ্রাবণ ঢাকানগরে আদিব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদসম্মত হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে একটী বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বহুকাল পরে ঢাকায় এপ্রকার বিবাহ আবার এই হইল এবং পাত্র ও পাত্রী, উভয় পক্ষই সম্ভ্রান্তবংশীয় বলিয়া আমরা এই বিবাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মনে করি।

রাজা রামমোহন রায় এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, উভয়েরই এই অভিপ্রায় ছিল যে, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া একেশ্বরবাদমূলক ধর্ম্ম এবং তৎসম্পৃক্ত অনুষ্ঠান প্রচার করেন। বেদ-উপনিষদের সাধনতত্ত্বকে তাঁহারা উভয়েই নিজ নিজ জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়া হিন্দুসমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন। এবিষয়ে তাঁহাদের মনোগত ভাব মহর্ষি-দেব তাঁহার একটী বক্তৃতায় সুন্দর ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"হিন্দুপ্রথা, হিন্দুরীতি, ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে হইবে। হিন্দুসমাজের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া যাহাতে হিন্দুরীতিনীতি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুযায়ী হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। * * * ব্রাহ্মেরা যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে আপনাদের শিরোভূষণ করিয়া পবিত্র হইয়াছেন, তাহা সকল হিন্দুসমাজে ওতপ্রোত করিয়া তাহার অশেষ কল্যাণসাধনে প্রাণপণে যত্ন করুন।

মহাত্মা রামমোহন রায় কি অভিপ্রায়ে এই ভারতবর্ষে এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন? এই ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য, কি চীনদিগের জন্য? একমেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরের উপাসনা যাহাতে হিন্দুসমাজে প্রচারিত হয়, তিনি এই উদ্দেশ্যে এই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন এবং বিদ্যাবাগীশ ও ন্যায়রত্ন মহাশয়দিগকে আচার্য্যের কর্ম্মে নিয়োগ করিলেন।" প্রকৃতই, কোন সমাজকে বৃথা চূর্ণবিচূর্ণ না করিয়া নূতনভাবে গড়িয়া তোলাই ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উদারতার অন্যতর পরিচয়। ধর্ম্মের বহির্বিকাশ হয় ধর্ম্মসংপৃক্ত অনুষ্ঠানে। সুতরাং সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিকেও সেই ভাবে সংগঠিত করিলেই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উদারতার প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। এই মূলমন্ত্রকে ভিত্তি করিয়াই বেদ উপনিষদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক গ্রন্থ এবং শাস্ত্রবিহিত বিধি অনুসরণ করিয়াই একেশ্বরবাদসম্মত আকারে সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি সম্বদ্ধ হইয়াছে। আদিব্রাহ্মসমাজ যে ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও তদবলম্বিত অনুষ্ঠান প্রচার করিতেছেন, তাহা যে ধীরে ধীরে হিন্দুসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতেছে, আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া আমরা তাহার পরিচয় পাইতেছি। আমরা শুনিতে পাই, এখন নানা কারণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে রেজেষ্ট্রী করিয়া আইনগত বিবাহ করিতে প্রস্তুত নন। এই কারণে আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেকে আদিসমাজের হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে বিবাহাদি অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

গত ২৮শে শ্রাবণ ঢাকায় এই প্রকার একটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহের পাত্র শ্রীমান সুধীরচন্দ্র ঘোষ সৌকালীন-গোত্রীয় এবং ঢাকার "পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের" সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও তথাকার অনাথ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা রায়সাহেব শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ উপাধিধারী। পাত্রী শ্রীমতী পদ্মিনী দেবী গোতমগোত্রীয়া এবং কুমিল্লার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের কন্যা। পাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ইনি সম্প্রতি সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা সারস্বত সমাজ হইতে "সরস্বতী" উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইনি সঙ্গীতেও সুশিক্ষিত হইয়াছেন।

সতীশ বাবুর জ্যেষ্ঠ জামাতা, সুবিখ্যাত ইঙ্গ-বঙ্গ অভিধানপ্রণেতা কৃতীপুরুষ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গুহ মহাশয়েরই মধ্যবর্ত্তিতায় এই বিবাহ সংঘটিত হইল। বর ও কন্যা, উভয় পক্ষ হইতেই আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট আহ্বান আসিল। উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় ক্ষিতীন্দ্র বাবুর সহচর হইয়া ঢাকায় গিয়াছিলেন। ক্ষিতীন্দ্র বাবু আচার্য্যের কার্য্য এবং বেদান্ততীর্থ মহাশয় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন।

পাত্রীর পিতা বিক্রমপুরনিবাসী রক্ষণশীল হিন্দু। তাঁহার মহা চিন্তা হইয়াছিল যে, আদিসমাজের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইলে তাঁহার রক্ষণশীল বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন বিবাহকে বৈধ বলিয়া স্বীকার করিবেন কি না এবং তাঁহাকে সমাজের মধ্যে গ্রহণ করিবেন কি না। এ বিষয়ে ক্ষিতীন্দ্র বাবুর সহিত কয়েকটী বন্ধু সহ তাঁহার সবিস্তার আলোচনার পর তাঁহারা এই পদ্ধতির বৈধতা ও হিন্দুভাব বুঝিয়া আহ্লাদের সহিত এই পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ অনুমোদন করিলেন। এমন কি, যতীন্দ্রবাবুর অশীতিকল্প বৃদ্ধ পিতামাতাও ক্ষিতীন্দ্রবাবুর সহিত আলোচনার পর সানন্দে অনুমোদন করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের বিবাহের একটী বিশেষত্ব এই যে, বিবাহসভায় আসিয়া বরের চতুর্দ্দিকে "সাত পাক" ঘুরিতে হয়। যতীনবাবু ও তাঁহার বন্ধুবর্গ আলোচনার সময় আদিসমাজের পদ্ধতির গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া এবিষয়ে আমাদের আপত্তি আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্ষিতীন্দ্রবাবু যখন বলিলেন "আপত্তি নাই", তখন দেখা গেল যে, তাঁহাদের প্রাণের ভিতর হইতে একটা গুরুতর পাষাণভার নামিয়া গেল। আদিসমাজের পদ্ধতির গূঢ়মর্ম্ম পূজ্যপাদ ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সাম্বৎসরিক উৎসববক্তৃতায় সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন—"ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত মন্তব্য কথা এই যে, যে জাতির যেরূপ জাতীয় প্রথা, যে কুলের যেরূপ কৌলিক প্রথা, তাহা সেইরূপই থাকুক; তাহার প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই; কেবল সেই সকল প্রচলিত অনুষ্ঠানের মধ্য হইতে পরিমিত দেবতাগণের উপাসনা সমূলে উঠিয়া গিয়া তাহার স্থলে বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা অধিরূঢ় হউক, তাহা হইলেই ব্রহ্মোপাসক ভক্তজনগণের বিশুদ্ধ ধর্ম্মব্রত অব্যাহত থাকিবে"। ক্ষিতীন্দ্রবাবু বর ও কন্যা উভয় পক্ষকেই সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, হিন্দুবিবাহেরও সকল জাতিরই বিবাহের ন্যায়, দুইটী প্রধান অঙ্গ—সম্প্রদান ও পাণিগ্রহণ। এই দুইটী অঙ্গই যথাযথ মন্ত্রসংপদ্ধতিতে রক্ষিত হইয়াছে। সপ্তপদীগমন হিন্দুবিবাহের পরিপূরক—তাহাও যথামন্ত্র পদ্ধতিতে রক্ষিত হইয়াছে। এই কারণে, এই বিবাহপদ্ধতি প্রবর্ত্তনের সময়ে কাশী, নবদ্বীপ, হাতীবাগান প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিতদিগের অভিমত চাওয়া হইলে তাঁহারা একবাক্যে ইহার বৈধতা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, উহা বিবাহের বৈধতাসাধক নহে, মাত্র মঙ্গলসাধক। এই কারণেই, মোক্ষমূলর, সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয়

প্রথম ব্যারিষ্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, স্বনামধন্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি যাঁহারা এই অনুষ্ঠানপদ্ধতির গূঢ় মর্ম্ম আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার বৈধতা ও সুতরাং হিন্দুপ্রাণতা স্বীকার করিয়াছেন।

বর যথাসময়ে কন্যাগৃহে উপস্থিত হইলে, দেশের প্রথা অনুসারে বিবাহ অনুষ্ঠানের পূর্ব্বেই স্ত্রীআচার সম্পন্ন হইয়া গেল এবং বর ও কন্যা বিবাহসভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেশের প্রথা অনুসারে বিবাহবেদীতে দণ্ডায়মান বরকে প্রদিক্ষণ করিয়া কন্যা "সাতপাক" ঘুরিলেন। অনন্তর যথাপদ্ধতি বরার্চনার পর ব্রহ্মোপাসনা হইয়া বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইল। সমগ্র বিবাহপদ্ধতিটী মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইয়াছিল, তাহাতে উপস্থিত নিমন্ত্রিতদিগের আদিসমাজের পদ্ধতির মর্ম্মগ্রহ করিবার বড়ই সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহারা এই অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য্যে ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

পরদিবস বর ও বধূ বরভবনে উপস্থিত হইলে ক্ষিতীন্দ্র বাবু যথারীতি উদীচ্য কর্ম্ম সমাধা করিলেন।

বিবাহসভায় বিক্রমপুরের অনেকগুলি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও যতীনবাবুর রক্ষণশীল বন্ধুবান্ধব এবং স্থানীয় নববিধান সমাজের ও সাধারণ সমাজের অনেকগুলি সভ্য সমাগত হইয়াছিলেন। বৈদিক মন্ত্রসমূহের উচ্চারণ এবং সেগুলির অর্থ ব্যক্ত করা তাঁহাদের বড়ই মনোগ্রাহী হইয়াছিল। তাঁহাদের অনেকে নিজের গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে এই প্রণালী প্রবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

উভয় দিনেই অনুষ্ঠান অন্তে প্রীতিভোজের বিশেষ আয়োজন হইয়াছিল। উভয় পক্ষের আদর-আপ্যায়নে কোন প্রকার ত্রুটী ছিল না।

এই বিবাহ উপলক্ষে বরের পিতা রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এবং কন্যার পিতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বসু আমাদের সম্বন্ধে আদর যত্ন যে প্রকার করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগের উভয়কেই আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গুহ মহাশয়কেও আমাদের সর্ব্বদা খোঁজখবর লইবার জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমাদের এই আন্তরিক প্রার্থনা যে, আমাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের সকল অনুষ্ঠানে সর্ব্বাগ্রে ভগবানের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হোক।

সমালোচনা।

ত্রিশূল—সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বিদ্যাপ্রমী। পরিচালক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্তদেব তর্করত্ন। পরিদর্শক—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। ২৭৬নং গরুড়েশ্বর, বেদোদ্বোধিনী সভা, বেনারস সিটি হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্র। ইহা বর্ত্তমানে সপ্তদশ বর্ষে চলিতেছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে এইরূপ মাসিকের প্রয়োজন এখনও আছে। ইহার প্রবন্ধগুলি চিন্তার উপাদান দেয়। বর্ত্তমান সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩৩৩) আমরা ইহার একটী বিশেষত্ব লক্ষ্য করিলাম যে, সহযোগীও এবার কালের গতির সহিত উদারভাবে চলিতে সংকল্প করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপে বর্ত্তমান সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির উল্লেখ করা যায়। সকল স্থানে সহযোগীর সহিত আমাদের মতের মিল না থাকিলেও প্রবন্ধগুলি যে সুপাঠ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। এই উচ্ছৃঙ্খলতার হুজুগের যুগে এই পত্রের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শক্তি—বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক। সম্পাদক—শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲; প্রতি সংখ্যা এক আনা।

আমরা এই নবীন সাপ্তাহিকের দেশনেতৃবর্গের চিত্রশোভিত জন্মাষ্টমী-সংখ্যা দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। এই সংখ্যায় 'শৃঙ্খলমোচন'-শীর্ষক নাট্যপ্রবন্ধ আমরা পাঠকবর্গকে পাঠ করিতে বলি। সম্প্রতি ইহা দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, তদুপলক্ষে আমরা ইহাকে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। অল্পদিন মাত্র এই সাপ্তাহিকটি প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহার নির্ভীক ভাব প্রথম অবধিই আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে, যে কোন অন্যায় বা অত্যাচার—তাহা যত "নামজাদা" বা "বড়" লোকের দ্বারা অনুষ্ঠিত হউক না কেন—যখনই শক্তির দৃষ্টিতে আসিয়াছে, তৎক্ষণাৎ এই পত্রিকা তাহার বিরুদ্ধে সবল প্রতিবাদ করিয়াছে। "নামজাদা" বা "বড়" লোকের ভয় কখনই শক্তিকে আপন কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে এইরূপ নির্ভীক পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন আছে—যাহা "বড়লোকের" বা "নামজাদা" লোকের ভয়ে সত্য কথা প্রকাশ করিতে ভয় পাইবে না—যাহা ধনীর অঙ্গুলীহেলনে চালিত হইবে না—যাহা দরিদ্রের মর্ম্মবাণী বুঝিবে ও প্রকাশ করিবে। এই আমরা নির্ভীক সহযোগীর দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

(শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বিজ্ঞাপনে ও চিত্রে স্বৈরাচার।

(শ্রীনারায়ণ ভারতী)

জাতীয় দৌর্ব্বল্য ও দৈন্য যখন চরমে গিয়া দাঁড়ায় তখন তাহা বিবিধ দুর্নৈতিক মায়ামূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া লোকসমক্ষে প্রকট হইতে থাকে। দুঃখ-পীড়িত এবং আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতির দুর্ব্বল মনস্তত্ব যেমন এক শ্রেণীর উপন্যাস ও কাব্যনাটকাদির মধ্য দিয়া আপাতরম্য ঘৃণ্য মূর্ত্তিতে দীপ্যমান হইতেছে; তেমনি 'আর্টের' পতাকাবাহী এক শ্রেণীর মাসিকপত্র-ব্যবসায়ী স্বব পত্রিকার প্রচারাধিক্যে লক্ষ্য বশতঃ রিরংসা-সন্দীপক চিত্র ছাপাইয়া জনসাধারণের মনে অসৎ আকাঙ্ক্ষায় অগ্নিদাহ সৃষ্টিপূর্ব্বক জাতীয় প্রকৃতিতে দৌর্বল্যের বিষবাষ্প সঞ্চার দ্বারা আর এক অভিনব উপায়ে জাতিকে বিনাশের পুষ্পিত পথে আকর্ষণ করিতেছেন। কলিকাতার দুই-একখানি মাসিকপত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে বাঙ্গালীজাতি স্বেচ্ছায় ধ্বংসের পথে নামিয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের ঐ সাময়িক পত্রিকাগুলির সহিত বঙ্কিম-যুগের "সাধারণী" "বঙ্গদর্শন" ও "বান্ধব" প্রভৃতির তারতম্য বিচার করিলে প্রতীয়মান হয় যে, সেই যুগের সাময়িকগুলি চাহিয়াছিল, স্বজাতিকে সত্য ও শক্তির দীক্ষা দিতে; আর, আধুনিক দুই-একখানি ব্যতীত অধিকাংশ সাময়িকেরই যেন উদ্দেশ্য,—স্বজাতিকে দৌর্ব্বল্যের মধুমিশ্রিত বিষ-প্রদানে নির্জ্জীবতার পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত করিয়া রাখা! বিশেষতঃ কলিকাতার কয়েকখানি মাসিকপত্রের তো একমাত্র ব্রতই হইয়া উঠিয়াছে,—লোচন-সংরোচক নারী-চিত্রের দ্বারা, প্রেম-গুঞ্জনাশ্লিষ্ট গল্পের দ্বারা পাঠকপাঠিকাগণের মনে লালসাবন্যা প্রবহমান করা! ইহারা হয়তো অধিক মাত্রায় সেই আর্টের ভক্ত যাহার মন্ত্র—Art for Art's sake—তাই সেই মূল মন্ত্রানুসারে ইহারা বৈধাবৈধনির্ব্বিশেষে যে কোন পন্থায় আর্ট সৃষ্ট করিয়া লোকের প্রাণে তথাকথিত আনন্দ দিতে উৎসুক!

আবার শুধু গল্প নয়, শুধু চিত্র নয়,—তৎসহ কাম-বৃত্তি-বর্দ্ধক বলিয়া মোদকজাতীয় ঔষধের চিত্রিত কুৎসিত বিজ্ঞাপনও অধিকাংশ সাময়িকের অঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়া তাহার পাঠকদিগকে অর্থ ও কীর্ত্তি-নাশার পথে নিত্য-নিয়ত আহ্বান করিতেছে! রতি-রসাত্মক গল্প, রিরংসা-মূলক চারুচিত্র, ও অশ্লীল বিজ্ঞাপন-প্রকাশ যেন আজ-কালকার মাসিকপত্রগুলির অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থলাভের আশায় দুর্নীতির অগাধ গহ্বরে যাহারা দেশবাসীকে টানিয়া লইয়া যায় তাহারা যে জাতির কত বড় শত্রু তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। দেশের এমনি অধঃপতন ঘটিয়াছে যে, "আর্টের" খাতিরে পূর্ব্ববর্ণিত অশ্লীল চিত্র ও গল্পগুজবের পক্ষ সমর্থন করিতে লোকের অভাব হয় না। শুনিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এক ব্যক্তি সেদিন এক সহরের টাউনহলে আর্টের দোহাই দিয়া এক "বাইনাচ" দেওয়াইয়া ছিলেন! ধিক্—ধিক্!

সাময়িক পত্রিকার কথা ছাড়িয়া দিলে আর এক দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়;—উহা নব-বর্ষের পঞ্জিকা। পঞ্জিকাগুলি দেশের খ্যাতনামা পণ্ডিত-বৃন্দের নামের ছাপ লইয়া প্রতিবৎসর বাহির হয় এবং লক্ষ লক্ষ নরনারীর গৃহে নিত্য ব্যবহার্য্যরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। দুঃখের কথা কাহাকে বলিব,—উহাতেও ঐ প্রকার বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি! বিচক্ষণ কবিরাজ মহাশয়েরা স্ব স্ব উপাস্য দেবতার নাম ও মূর্ত্তির সহিত নানাবিধ তৈল প্রভৃতির অশ্লীল নীতিবিগর্হিত বিজ্ঞাপন সংযোগ করিয়া খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেছেন কি? হিন্দু ব্যতীত অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ স্ব স্ব উপাস্য দেবতার মূর্ত্তির সহিত ঐ শ্রেণীর অশ্লীল বিজ্ঞাপন জুড়িয়া ছাপিতে সঙ্কোচ ও পাপ বোধ করেন। উহাতে সত্যই দেবমর্য্যাদা লাঘব হইয়া বালকবালিকাগণের সম্মুখে এক ভয়াবহ নরক-দ্বার উদ্ঘাটিত হইতেছে কিনা দেশের সুধী ও মনস্বী ব্যক্তিগণ তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। স্বীকার করি, কবিরাজী চিকিৎসাপুস্তকে হয়তো ঐ জাতীয় এবং ঐ নামীয় ঔষধ থাকিতে পারে;—কিন্তু তাহা কি বিকৃত অশ্লীল চিত্র ও বিজ্ঞাপন সহ ছাপাইয়া সাধারণ্যে এবং বালকবালিকাগণও যাহা সর্ব্বদা নাড়াচাড়া করে সেই পঞ্জিকাতেও প্রচার করা যুক্তিসিদ্ধ? অনেক ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীও দুপয়সা লোকসান হইবে বুঝিয়া ঐ শ্রেণীর বিজ্ঞাপন স্বায় পত্রিকা হইতে দূরীভূত করিতে পারেন না! বিনীতভাবে আমরা প্রস্তাব করিতে চাই, দেবতার নাম দিয়া, দেবতার ছবি দিয়া কোন-রূপ বিজ্ঞাপন, পঞ্জিকায় বা পত্রিকাদিতে যেন মুদ্রিত না হয়। বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপনগ্রহীতা উভয়েরই এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। বলা বাহুল্য যাঁহারা দেশের ও সমাজের কল্যাণপ্রার্থী, তাঁহাদের নিকট আমাদের এই প্রস্তাবটী অতিশয় অন্যায় বলিয়া মনে হইবে না। বড়ই দুঃখের কথা, কোথায় সাহিত্য বা ধর্ম্মবিষয়ক পত্রের পরিচালকগণ এই শ্রেণীর বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে একথা কঠোরভাবে প্রকাশ করিবেন,—তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা স্বয়ংই বিজ্ঞাপনদাতাগণের প্রদত্ত অর্থের প্রতি লোভবশতঃ স্বকীয় ধর্ম্ম ও দেশকল্যাণকে জলাঞ্জলি দিতে দুঃখ ও লজ্জাবোধ করেন না। পত্রিকার

মধ্যে উপন্যাসের বিজ্ঞাপনসমন্বিত যে সব কুৎসিৎ চিত্র ছাপা হয় উহাও ন্যক্কারজনক। সাহিত্য ও পত্রিকা মানুষের নিত্য সহচর। গৌণভাবেও তাহার মধ্য দিয়া দুর্নীতি বিস্তার শুধু যে নিন্দার্হ এবং অশ্রদ্ধের তাহা নয়, উহা কলঙ্কের ও দুর্নামের কথা। পত্রিকাপ্রচারকগণের এই অশ্লীল চিত্রবিস্তার-প্রয়াস তাঁহাদের মেরুদণ্ডস্বরূপ গ্রাহকগণ মনঃসংযোগ করিলে সহজে উপশমিত হইতে পারে। এই জন্য সংবাদপত্রে বারম্বার আলোচনা হইলে এবিষয়ে সুফল দর্শিবার সম্ভাবনা আছে।

ক্যাণ্ডি-ভ্রমণ।

(অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ পি-এইচ. ডি)

ক্যাণ্ডি (Kandy) সিংহল-দ্বীপের একটী বিখ্যাত স্থান। ইহা সিংহল-গভর্ণমেণ্টের গ্রীষ্মাবাস। পৃথিবীর নানাস্থান হইতে পর্যাটকেরা সিংহলে আসিলেই ক্যাণ্ডি সহরটী একবার পরিদর্শন করেন—মনোরম দৃশ্যের জন্যই ইহার এত নাম। অত্যুচ্চ পাহাড়ের উপর ক্যাণ্ডি অবস্থিত। সমুদ্রের সমতল হইতে ইহার উচ্চতা ১৯০২ ফিট্। কলম্বো হইতে ক্যাণ্ডি ৭৪॥ মাইল দূরে, ট্রেণে যাইতে ৪।৪॥ ঘণ্টা লাগে। এই রেলওয়েটি সিংহল-গভর্ণমেণ্টের।

ক্যাণ্ডি যাত্রীর মধ্যে আমরা তিনজন ভারতবাসী ছিলাম। কলম্বো ফোর্ট ষ্টেশন হইতে আমরা ক্যাণ্ডির ট্রেণে উঠিলাম। যদিও কলম্বো একটী খুব বড় বন্দর, কিন্তু ইহার এই প্রধান রেলওয়ে ষ্টেশনটী তেমন কিছু বড় নয়, বরং ছোটই বলিতে হইবে। ট্রেণে বিশেষ কিছু ভিড় ছিল না, আমরা একটী কামরায় উঠিয়া বেশ আরাম করিয়া বসিলাম। আমাদের কামরাতে আমরা তিনজন ভারতবাসী ও একজন ফরাসী পর্য্যটক ছিলেন। বেলা প্রায় ২॥টার সময় আমাদের ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এই সুদূর দেশের চারিদিকের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে পাইলাম চারিদিকেই সমতল ভূমি, আমাদের বাংলা দেশের ন্যায় চারিদিকেই গাছপালার খুব সমাবেশ এবং মাঠে মাঠে চারিদিকেই জল। বর্ষাকালে আমাদের বাংলা দেশের যেরূপ দৃশ্য হয়, ইহাও কতকটা সেইরূপ; সুতরাং জন্মভূমির সহিত এই সাদৃশ্য দেখিয়া আমাদের মনে বিশেষ আনন্দ হইতে লাগিল। চারিদিকের গাছপালাগুলির সতেজ শ্যামল সৌন্দর্য্য দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যে, এই দেশের জমি নিশ্চয়ই খুব উর্ব্বরা; এবং বাস্তবিকই তাহাই, কারণ শুনিলাম যে, এমনকি অষ্ট্রেলিয়া হইতে যে সকল পর্য্যটক সিংহলে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও নাকি একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে সিংহলের জমি অষ্ট্রেলিয়ার জমি অপেক্ষাও অধিক উর্ব্বরা। কিন্তু একটা জিনিস যাহা আমাদের বাংলা দেশে চারিদিকেই দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ ধানের ক্ষেত, তাহা তো কোথাও দৃষ্টিগোচর হইল না; বোধ হয় এখানে ধানের চাষ অধিক হয় না।

আমাদের ট্রেণ দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল, আর আমরাও চারিদিকের শ্যামল সরস দৃশ্য দেখিয়া নয়ন-মন তৃপ্ত করিতে লাগিলাম। অনেক দূর আসার পরও যখন কোনও পাহাড় আমাদের নয়নপথে পড়িল না, তখন মনে একটু হতাশার উদয় হইতে লাগিল; মনে হইতে লাগিল যে, আমরা যে শুনিয়াছিলাম ক্যাণ্ডি সহরটী খুব উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত সে কথা কি তাহা হইলে সত্য নয়? মনে এইরূপ আন্দোলন হইতেছে এমন সময় আমাদের ট্রেণ একটী বড় ষ্টেশনে আসিয়া অনেকক্ষণ থামিয়া রহিল। ইহার কারণ আমরা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, আমরা ক্যাণ্ডির মাঝপথে আসিয়াছি এবং এই স্থান হইতে পাহাড়ের উচ্চ পথ আরম্ভ হইবে বলিয়া আর একখানি এঞ্জিন গাড়ীর পিছনে যুতিয়া চলিবে, সেই জন্য একটু দেরী হইতেছে। এই কথা জানিয়া আমাদের মনে বড় আনন্দ হইল, ভাবিলাম—যাক্, আমাদের মনোবাঞ্ছা বোধ হয় এইবার পূর্ণ হইবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্রেণ ছাড়িয়া দিল এবং আমরা বুঝিতে পারিলাম যে পাহাড়ের উচ্চ পথ আরম্ভ হইয়াছে, কারণ ট্রেণটা বেশ আস্তে আস্তে চলিতেছে। আমরা মহা কৌতূহলপরবশ হইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। অল্পক্ষণের ভিতরেই বড় বড় পাহাড় আমাদের নয়নপথে পড়িতে লাগিল এবং আমাদের ট্রেণ এই সব পাহাড়পথের ভিতর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিল।

ট্রেণ ক্রমেই যত পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিল ততই চারিদিকের মনোরম দৃশ্য আমাদের নয়নগোচর হইতে লাগিল; কিন্তু একটা দুর্ভাগ্যের বিষয় এই ছিল যে চারিদিকেই খুব বৃষ্টিপাত হওয়াতে ও রৌদ্রের চিহ্নমাত্র না থাকাতে প্রকৃতির এমন সৌন্দর্য্য অনেকটা ম্লান হইয়া গিয়াছিল। যদিও তখন নভেম্বর মাস, তথাপি ঐ সময় এখানে বর্ষাকাল—তাই এত বৃষ্টি! চতুর্দ্দিকে উচ্চ উচ্চ পাহাড়ের গাত্র কাটিয়া কাটিয়া রেলের লাইন চলিয়া গিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে বড় বড় সুড়ঙ্গও রহিয়াছে। এই পাহাড়গুলির উপরে এক এক স্থানের দৃশ্য এত মনোরম যে স্বচক্ষে না দেখিলে বর্ণনা করা যায় না।

এই সকল মনোরম দৃশ্য দেখিয়া আমাদের মন একেবারে গভীর আনন্দে পূর্ণ হইয়া যাইতেছিল। আমাদের গাড়ীতে যে ফরাসী ভদ্রলোকটী ছিলেন, তাঁহাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে তিনিও স্বীকার করিলেন যে, ইহা এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এবং পৃথিবীর আর কোথাও ইহা অপেক্ষা অধিক মনোরম দৃশ্য বোধ হয় থাকিতে পারে না। চারিদিকেই অতি উচ্চ উচ্চ পাহাড়, পাহাড়গুলির গা কাটিয়া সব ধানের ক্ষেত বিরাজমান (এই প্রথম ধানের ক্ষেত এদেশে দেখিলাম), দূরে দূরে পাহাড়গুলির গায়ে গায়ে সব মেঘ জমিয়া রহিয়াছে এবং তারপর একটী নূতন দৃশ্য—যাহা আমাদের ভারত-বর্ষে বোধ হয় দেখা যায় না—এই পাহাড়গুলির মাথা হইতে নীচে অবধি কলা ও নারিকেল গাছে পূর্ণ, ইহাতে পাহাড়গুলির সৌন্দর্য্যকে অতি অপূর্ব্ব করিয়া তুলিয়াছে। পাহাড়গুলির উপরে ষ্টেশন বড় নাই, কারণ এখানে লোকের বসতিই নাই। কেবল মাঝে মাঝে ও অনেক দূরে দূরে এক-একটা ছোট ষ্টেশন এবং তার আশে পাশে ২।৪ ঘর লোকের বসতি। ট্রেণ যতই ক্যাণ্ডি অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, আমাদের মনও ততই উৎসুক হইয়া উঠিতে লাগিল—কতক্ষণে ক্যাণ্ডিতে পৌঁছিয়া সহরটা একবার পরিদর্শন করিব।

তখন সন্ধ্যা প্রায় সাতটা, আমাদের ট্রেণ ক্যাণ্ডি ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল আর বেশ অন্ধকারও হইয়া গিয়াছিল, কাজেই সেই দিন সহর দেখার আশা একেবারেই ছাড়িতে হইল; তখন কেবল এই ভাবনা হইতে লাগিল যে, এই বিদেশে কিরূপে নিরাপদে একটী আশ্রয়ে গিয়া উঠিব? ক্যাণ্ডি ষ্টেশনে টেণ পৌঁছিতেই ভিন্ন ভিন্ন হোটেলের তক্‌মাধারী সব লোক আমাদের আসিয়া ধরিতে লাগিল তাহাদের হোটেলে গিয়া থাকিবার জন্য। ক্যাণ্ডিতে Queen's Hotelই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও ভাল এবং এখানে থাকার খরচাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই হোটেলটী ইউরোপীয়-দিগের দ্বারা পরিচালিত এবং ইহার অবস্থিতি (position) অতি মনোরম—সুবিখ্যাত ক্যাণ্ডি লেকের উপরেই। আমরা যে হোটেলের লোককে ঠিক করিলাম সে আমা-দের জিনিষপত্রগুলি সহ আমাদিগকে তাহার হোটেলের গাড়ীতে চড়াইয়া গাড়ী ছুটাইয়া দিল। অন্ধকারের ভিতর দিয়া উৎসুকনেত্রে আমরা চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম—যদি কিছু দেখিতে পাওয়া যায় এই আশায়, কিন্তু অন্ধকারের গভীরতা হেতু সে আশায় নিরাশ হইতে হইল। অল্পক্ষণের ভিতরেই আমরা হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা যে হোটেলে আসিয়া উঠিলাম তাহার নাম King's Hotel। এই হোটেলের বাড়ীটা আমাদের এখানকার পশ্চিমের বাংলার ধরণের, বিতল গৃহ—মোটের উপর মন্দ নয়; সকল ঘরেই ইলেকট্রীকের আলো আছে। আমরা যখন গিয়াছিলাম তখন মরশুম (season) নহে বলিয়া হোটেলের লোকের মোটেই ভীড় ছিল না। কারণ হস্তপ্রক্ষালনাদি সমাপনান্তে অল্প বিশ্রামে পথের ক্লান্তি দূর করিয়া সন্ধ্যায় ভোজন শেষ করা গেল এবং সকাল সকাল শুইতে যাওয়া গেল।

নূতন সহর দেখিবার ঔৎসুক্যে আমাদের ঘুম খুব সকালেই ভাঙ্গিয়া গেল। প্রাতঃকৃত্য ও আহারাদি সমাপনান্তে একটী ফিটন্ গাড়ী ভাড়া করিয়া আমরা সহর পরিদর্শনার্থে বাহির হইলাম। এখানে ফিটন্, ট্যাক্সি ও রিক্স যথেষ্ট ভাড়া পাওয়া যায়, এবং প্রত্যেক হোটেলেরই নিজেদের ফিটন ও ট্যাক্সি আছে—চাহিলেই ভাড়া পাওয়া যায়। পূর্ব্বদিন রাত্রে খুব বৃষ্টি হইয়া যাওয়ায় সকাল বেলাটা বেশ পরিষ্কার হইয়া গেল এবং বেশ রৌদ্রও উঠিল। ক্যাণ্ডিতে দর্শনোপযোগী স্থান এই গুলি—Temple of the Tooth, Kandy lake ও Peradeniyaর Botanical Garden. Temple of the Tooth ও Kandy lakeটী সহরেরই ভিতর, কিন্তু Botanical Gardenটী সহর হইতে ৭।৮ মাইল দূরে; তবে যাইবার কোনও অসুবিধা নাই, বেশ পাকা রাস্তা আছে।

আমাদের গাড়ী বাজারের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া Temple of the Toothএ আসিয়া হাজির হইল। ইহা হইতেছে একটী বহু প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির এবং ইহার নাম সুবিখ্যাত। বাহির হইতে দেখিতে মন্দিরটী এমন কিছুই চিত্তাকর্ষক নহে, তবে একটী বহু প্রাচীন কীর্ত্তি বলিয়াই সকলের দেখিবার জিনিষ। মন্দির-গাত্রে কোথাও কোথাও দুই তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের কারু-কার্য্য এখনও খচিত রহিয়াছে, তবে অধিকাংশ স্থলেই পূর্ব্বে যেরূপ কারুকার্য্য ছিল তাহারই অনুকরণে নূতন করা হইয়াছে। যাঁহারা পুরাতন শিল্পের বিষয় জানিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট এই মন্দির একটী বিশেষ দর্শনীয় পদার্থ। মন্দিরটী বিশেষ কিছু বড় নহে। একজন গাইড্ আমা-দিগকে মন্দিরটী ভাল করিয়া ঘুরাইয়া দেখাইল ও অনেক ঐতিহাসিক জিনিস বুঝাইয়া দিল, কিন্তু আমরা উক্ত বিষয়ে অনভিজ্ঞ ও বিশেষ অনুসন্ধিৎসু না হওয়ায় আর সে বিষয়ে অধিক আলোচনা করিলাম না। মন্দি-রের ভিতরে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি ও প্রতিকৃতি দেখিলাম। শুনিলাম, প্রতিবৎসর এই মন্দির হইতে একবার করিয়া একটা খুব বড় মিছিল বাহির হয় এবং সহরের চারিদিকে ঘুরিয়া আসে। সেই সময়ে এই মন্দিরে এক মহোৎসব হয়।

এই মন্দিরে একটী লাইব্রেরী আছে। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম

সংক্রান্ত অনেক বই, পুঁথি প্রভৃতির সংগ্রহ আছে। একজন বৌদ্ধ পুরোহিত ইহার তত্ত্বাবধান করেন। লাইব্রেরীর ঘরটী দ্বিতলের উপর এবং ইহার চতুর্দ্দিকে বারান্দা আছে। এখান হইতে সহরের অনেকটা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানটী অতি মনোরম,—সহরের কোলাহলের বাহিরে অতি নির্জ্জন 'ক্যাণ্ডি লেকের' পার্শ্বেই। লাইব্রেরীটী বিশেষ বড় না হইলেও বই অনেক আছে, বৌদ্ধধর্ম্ম-বিষয়ক বহু ইংরাজী পুস্তকও দেখিলাম। পুঁথিগুলি সব সিংহলী ভাষায় লিখিত, সুতরাং আমাদের বুঝিবার কোনও উপায় ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু না হওয়ায় আমরা অধিকক্ষণ সেখানে অতিবাহিত করিলাম না। পুরোহিত মহাশয়ের সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম তিনি বেশ ইংরাজী জানেন এবং অতি উদার মতের লোক। পুরোহিত মহাশয় তাঁহাদের Visitors' book এ আমাদের নাম প্রভৃতি সহি করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে দেখিলাম যে Prince of Wales এরও নাম সহি রহিয়াছে। Prince of Wales যখন ভারত পরিদর্শনে আসেন, তখন তিনিও ক্যাণ্ডির এই বৌদ্ধ মন্দির দর্শন করেন। পুরোহিত মহাশয়ের জন্য কিছু দক্ষিণা রাখিয়া আমরা গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম।

আমাদের গাড়ী এইবার 'ক্যাণ্ডি লেকের' ধার দিয়া চলিতে লাগিল। এই হ্রদটী অতি চমৎকার এবং এই স্থানের দৃশ্যটীও অতি মনোরম। চারিদিকেই পাহাড় এবং সেই সব পাহাড়ের উপর লোকেদের বাড়ী, হোটেল, পার্ক প্রভৃতি অবস্থিত। সহরের মধ্যে এই স্থানটীই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও মনোরম এবং এই স্থানেই ইউরোপীয়েরা বাস করেন। হ্রদটী বেশ বড় এবং ইহার জল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ ও ঝক্‌ঝকে। আমাদের গাড়ী এই হ্রদের ধার দিয়া আঁকা বাঁকা পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল।

অল্পক্ষণের ভিতর আমাদের গাড়ী Botanical Garden এর পথে আসিয়া পড়িল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ক্যাণ্ডি সহর হইতে Botanical Garden প্রায় ৭। ৮ মাইল, সুতরাং সেখানে পৌঁছিতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগিল। পথে এমন কিছু চক্ষে পড়িল না যাহা বিশেষ বর্ণনার যোগ্য। রাস্তার দুই ধারে ছোট ছোট বস্তি আর কুঁড়েঘর—যেরূপ আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের পথে সচরাচর দেখা যায়। শৈশবে শুনিতাম—'সোনার লঙ্কা', কিন্তু আজ লোকগুলির অবস্থা দেখিয়া বিপরীত ধারণাই হইল; আমাদের দেশের গরীব লোকেদের অপেক্ষা ইহাদের অবস্থা কোনও অংশে ভাল নয়। আমাদিগকে নূতন লোক দেখিয়া অনেকেই হাঁ করিয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আমাদের গাড়ী অবশেষে Botanical Garden এর দ্বারে আসিয়া হাজির হইল। ইহার সহিত একটী agricultural school ও একটী agricultural experimental station আছে। আমরা বাগানে প্রবেশ করিতেই একজন গাইড্ আসিয়া আমাদিগকে বাগানের ভিতর লইয়া চলিল এবং নানা রকমের গাছ দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিল; কিন্তু উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে একেবারেই অনভিজ্ঞ হওয়ায় তাহাতে আমাদের বিশেষ কিছু আগ্রহ জন্মাইতেছিল না। তবে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ হইলেও এ কথা বলিতে পারি যে, এই বাগানটীতে গাছপাছড়ার খুব সমাবেশ আছে এবং এইজন্য ইহার নামও সুবিখ্যাত। বাগানটীর এক এক স্থানের দৃশ্য অতি মনোরম—বিশেষতঃ ইহার একদিকের প্রান্তটীর দৃশ্য। বাগানটীর এই প্রান্তে বড় বড় পাহাড় এবং সেই সব পাহাড়ের গাত্র রবার ও চায়ের চাষে ভরা। চায়ের ক্ষেতগুলি দেখিতে অতি মনোরম, ছোট ছোট গাছগুলি পাহাড়ের গায়ে এমন সুন্দর সারি দিয়া জন্মাইয়াছে যে দেখিলে চোখ জুড়ায়! রবার গাছগুলি খুব লম্বা লম্বা ও সোজা। সেইদিনই বেলা ২॥টার গাড়ীতে কলম্বোতে ফিরিতে হইবে বলিয়া সত্বর দেখার কার্য্য সমাধা করিয়া হোটেল অভিমুখে যাত্রা করা গেল।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় আমরা আমাদের হোটেলে আসিয়া পৌঁছিলাম। আড়াইটার ট্রেণ ধরিতে হইবে বলিয়া আমরা শীঘ্র শীঘ্র মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিয়া ও হোটেলের সব দেনাপাওনা চুকাইয়া দিয়া ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইলাম। ট্রেণে বিশেষ কিছু ভিড় ছিল না, আমরা একটী কামরাতে উঠিয়া আরামে বসিয়া পথের ক্লান্তি দূর করিতে লাগিলাম। যথাসময়ে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল, পথে আবার মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। গাড়ীতে চুপচাপ বসিয়া বসিয়া কেবল ক্যাণ্ডির স্মৃতিই মনে জাগিতে লাগিল। ট্রেণ কলম্বো অভিমুখে ছুটিতে লাগিল, ক্রমে পাহাড়ের পথ অতিক্রম করিয়া আমরা সমতল ভূমিতে আসিয়া পড়িলাম। সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় ট্রেণ কলম্বোতে আসিয়া পৌঁছিল এবং আমরা তাড়াতাড়ি ট্রেণ হইতে নামিয়া জিনিষপত্রগুলি লইয়া ভারতবর্ষে ফিরিবার ট্রেণে উঠিয়া পড়িলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, চারিদিক অন্ধকারে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, ষ্টেশনে লোকের কোলাহলের মধ্য হইতে হুস্ হুস্ করিয়া ট্রেণ ছাড়িয়া দিল এবং অন্ধকার ভেদ করিয়া সন্ সন্ করিয়া ছুটিতে লাগিল। ভারতবর্ষে ফিরিবার জন্য মনটা আনন্দে ভরপুর থাকিলেও সেই সব পুরাতন স্মৃতি মধ্যে মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া মনটাকে যেন একটা বিষাদের ছায়াতে ঘিরিয়া ফেলিতেছিল!

সংবাদ।

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তিশাখার আমন্ত্রণ।

আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে জেনেভা-(Geneva) স্থিত বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের (League of Nations) শান্তিবিধায়িনী (For the World's supreme peace) শাখা, আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সাদর আমন্ত্রণ করিয়াছেন। এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যের সহিত প্রায় অভিন্ন। সুখের বিষয় এই যে, সঙ্ঘ এতদিনে বুঝিয়াছেন যে বিশ্বে প্রকৃত শান্তি আনিতে হইলে ধর্ম্ম ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই এবং সেই ধর্ম্মও সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা-বর্জ্জিত হওয়া চাই; ইহা বুঝিয়াই সঙ্ঘ উক্ত কার্য্যের জন্য এই শাখা স্থাপন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ আজ প্রায় শতাব্দী ব্যাপিয়া যে কাজ নীরবে করিয়া আসিতেছেন, এইবার তাহা সঙ্ঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে দেখিয়া আশা হয় যে, সঙ্ঘ যদি কর্ম্ম-কোলাহলে এই লক্ষ্য হারাইয়া না ফেলেন ত' বিশ্বে প্রকৃত শান্তি আসিবার সূত্রপাত হইবে।

শোক-সংবাদ।

কবিরাজ ৺যামিনীভূষণ সেন—'কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের' প্রতিষ্ঠাতা খ্যাতনামা কবিরাজ যামিনীভূষণ সেন এম এ, এম-বি মহাশয় গত ২৩শে শ্রাবণ বুধবার পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে যুগোপযোগী ও উন্নত করিবার জন্য যাঁহারা যত্নশীল, কবিরাজ মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রানুরাগী ও স্বদেশভক্ত অতি অল্পই দেখা যায়। তিনি রাজকীয় সংস্কৃত কলেজে নিম্নশ্রেণী হইতে এম-এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন এবং আজীবন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতি অনুরাগ পোষণ করিতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি একজন সভ্য ছিলেন। সাধারণ সভাসমিতিতেও তাঁহাকে যোগদান করিতে দেখা যাইত। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও তিনি তাঁহার জাতীয়ব্যবসায় কবিরাজীকেই অবলম্বন করিয়া স্বধর্ম্ম ও স্বদেশানুরাগেরই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অনুদার ছিলেন না। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে সর্ব্বজাতীয় ছাত্রের প্রবেশাধিকার তাহার একটী অন্যতম নিদর্শন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। ইঁহার মত একজন গুণবান ব্যক্তির এরূপ অকালবিয়োগ দেশের দুর্ভাগ্য সূচনা করিতেছে। আমরা ইঁহার শোকসন্তপ্ত পুত্র ও পরিজনদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহাদের শোকে সান্ত্বনা দান করুন।

৺হেমাঙ্গিনী দাশ। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীসুন্দরী মোহন দাশ মহাশয়ের পত্নী হেমাঙ্গিনী দাশ গত ২রা ভাদ্র বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল ৭-১৫ মিনিটের সময় পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি কিছু দিন হইতে বেরীবেরী রোগে ভুগিতেছিলেন। উক্ত দিবস হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া রুদ্ধ হওয়ায় মৃত্যু ঘটে। ইনি সাধারণের কার্য্যে ও সভাসমিতিতে যোগ দিতে কখনও আলস্য প্রকাশ করিতেন না। ইঁহার দানশীলতা ও উন্নতহৃদয়ের বহু পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা ইঁহার শোকার্ত্ত স্বামী-পুত্র-পরিজনদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মার সদ্গতি বিধান করুন।

জাগো হিন্দুস্থান।

খাম্বাজ—পটতাল।

গান—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এস্ সি। স্বরসংবাদ—শ্রীবাণীদেবী।

নবীন ভারত! গাহ নবীন সুরে
"জাগো জাগো হিন্দুস্থান।
মহা জাগরণ আজি তব দ্বারে
জাগো আজি হিন্দুস্থান॥"
মুছাও, অশ্রুধারা দুঃখজ্বালা
ঘুচাও এ ক্রন্দন গান।
বিবুধ-নিষেবিত সজ্জন-সেবিত
সুরনর-বন্দিত পুরাণ এ ভারত
জাগো রে জাগো আবার॥

বিশ্ববাসী গাহে আজি
তোমারি নাম।
গাও একতানে একপ্রাণে
"জাগো হিন্দুস্থান॥"
জাগো জাগো হিন্দুস্থান।
গাহ "জয় জয় হিন্দুস্থান"॥
হোক্ ভারতের যশোগান।
গাও "জাগো হিন্দুস্থান॥"

গানটি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে গীত হইবে। ইহা বেহালা এস্রাজ সেতার শরদ প্রভৃতি যে কোন যন্ত্রে বাজানো যাইতে পারে। ইহা বিভিন্ন যন্ত্রে বিভিন্ন সপ্তকে—নিম্ন সপ্তকে (খাদে), মধ্য সপ্তকে ও উচ্চ সপ্তকে (তারায়)—বাজাইতে হইবে। যদি এস্রাজে নিম্নসপ্তকের বা খাদের গা অর্থাৎ গ্‌া বাজাইতে অসুবিধা হয়, তবে গ্‌া এর স্থলে প্‌া অর্থাৎ খাদের পা বাজাইলেই চলিবে। সেতারে যিনি বাজাইবেন, তিনি যেখানে "-া" কার চিহ্ন দেখিবেন সেখানে প্রত্যেক "-া" কার চিহ্নের জন্য একটি করিয়া ঝঙ্কার বাজাইবেন। ঋ=কোমল রা, জ্ঞা=কোমল গা, হ্মা=কড়ি মা, দা=কোমল ধা, ণা=কোমল না। হসন্ত=খাদের চিহ্ন, রেফ=তারার চিহ্ন।

১ ২ ৩ ৪ ৫
{ | মা মা -া মা | পা -া পা পা | মপা ধা ধা ধা | পা ধা ণা র্সা | র্র্সা না র্সা -া |
ন বী ∘ ন ভা ∘ র ত গা∘ ∘ হ ন বী ন সু ∘ রে∘ ∘ ∘ ∘

---

৬ ৭ ৮ ৯ ১০
| ণধা পা ধা -া | ণা র্রা র্সা -া | ণা -া -া -া | ধা -া -া -া | পা -া -া গা |
∘∘ ∘ ∘ ∘ জা ∘ গো ∘ জা ∘ ∘ ∘ গো ∘ ∘ ∘ হি ∘ ∘ ন্দু

---

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
| মা -া ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ | ণা -া -া -া | র্সা -া -া -া | র্গা -া -া র্পা |
স্থা ন্ জা ∘ ∘ ∘ গো ∘ ∘ ∘ হি ∘ ∘ ন্দু

---

১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০
| র্মা -া ৩ ৪ | র্সা -া -া পা | ধা -া -া -া | পা -া -া ধা | মা -া ৩ ৪ |
স্থা ন্ জা ∘ ∘ ∘ গো ∘ ∘ ∘ হি ∘ ∘ ন্দু স্থা ন্

২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫
| মা মা -া মা | পা -া পা পা | মপা ধা ধা ধা | পা ধা ণা র্সা | র্রসা না র্সা -া |
ন বী • ন ভা • র ত গা• • হ ন বী ন সু • রে • • • •

---

২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ॥
[৩ ৪]
| ণধা পা ধা -া | ধা -া -া ণা | র্সা -া -া -া | পা -া -া পা | মা -া মা মা |
•• • • • আ • • • গো • • • হি • • ন্দু স্থা ন্ ম হা

---

৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫
| মা -া -া র্মা | র্মা -া র্মা -া | র্মা -া র্মা র্গা | র্রা র্গা র্মা র্পা | র্মা -া -া -া |
আ • • গ র্ • ণ • আ • জি • ত ব ধা • রে • • •

---

৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০
| ধা -া ণা -া | র্সা -া -া -া | র্সা -া র্সা -া | ণা -া র্রা -া | র্সা -া -া -া |
জা • • • গো • • • আ • জি • জা • • • গো • • •

---

৪১ ৪২ ৪৩
| ণা -া ধা -া | পা -া -া গা | মা ২ ৩ ৪ }
আ • জি • হি • • ন্দু স্থান্

---

৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮
| ণা ধা -া -া | ণা ধা ণা র্জ্ঞা | র্রা -া -া -া | র্সা র্রা র্মা র্জ্ঞর্রা | র্সা -া -া -া |
মু ছা • ও অ • শ্রু ধা রা • • • দু ঃ খ আ• না • • •

---

৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩
| ণা ধা ণা র্জ্ঞা | র্রা ২ ৩ ৪ | র্সা র্রা র্মা র্জ্ঞর্রা | র্সা ২ ৩ ৪ | র্গা র্গা -া র্গা |
ঘু চা ও এ

---

৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮
| র্গা র্মগা র্রা র্গা | র্মা -া -া -া | -া -া -া -া | র্মা র্মা র্পা র্মা | র্গা -া র্মা র্গা |
ক্র • ন্দ ন গা • • • • • • ন্ বি বু ধ নি ধে • বি ত

৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩
| র্রা -া র্জ্ঞা র্রা | র্সা -া র্রা র্সা | র্সা র্সা র্রা র্সা | ণা -া র্সা ণা | ধা ধা ণা ধা |
স • জ্জ ন সে • বি ত সু র ন র ব • ন্দি ত পু রা ণ প্র

৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮
| পা -া ধা পা | পা -া ধা পা | মা -া পা গা | মা -া -া -া | মা -া পা -া |
ভা • স্ব ত জা • গো রে জা • গো আ বা • • র্ বি • শ্ব •

৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩
| ধা -া ণা -া | র্সা -া র্রা -া | র্সা -া র্রা -া | র্গা -া -া -া | -া -া র্রা র্সা |
ধা • সী • গা • হে • আ • জি • তো • • • • • মা ঝি

৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮
| -া -া -া -া | র্মা -া া -া | -া -া র্সা -া | {র্সা র্রা র্সা | র্মা র্জ্ঞা র্রা |
• • • • না • • • • ম্ গা ও এ • ক তা • নে

৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩
| র্সা র্রা র্সা | র্মা র্জ্ঞা র্রা | ণা ধা পা | ধা ণা -া |} র্মা -া -া র্মা |
এ • ক প্রা • ণে জা গো হি ন্দু স্থা ন্ জা • • গো

৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮
| র্মা -া র্জ্ঞা -া | র্রা -া র্সা -া | ণা -া -া -া | র্মা -া -া র্মা | র্মা র্মা র্জ্ঞা র্জ্ঞা |
জা • গো • হি • ন্দু • স্থা • • ন্ গা • • হ জ য় জ য়

৮৯ ৯০
| র্রা -া -া র্সা | ণা -া মা -া | র্মা -া -া র্মা | র্মা -া র্জ্ঞা -া | র্রা -া -া র্সা |
হি • • ন্দু স্থা ন্ হো ক্ ভা • • র তে • র • ব • • শো

৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪
| ণা -া ণা -া | মা -া -া -া | পা -া -া -া | ধা -া -া ধা | ণা -া -া -া II II
গা ন্ গা ও জা • • • গো • • • হি • • ন্দু স্থা • • ন্

জাগো হিন্দুস্থান।

খাম্বাজ—পটতাল।

গান—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এস্ সি। স্বরসম্বাদ—শ্রীবাণীদেবী।

সমগ্র স্বরসম্বাদটি

কেবল

এস্রাজ ও অনুরূপ যন্ত্রের জন্য।

১ ২ ৩ ৪ ৫

| র্মা -া -া -া | র্রা -া -া -া | র্মা -া -া -া | র্গা র্মা র্গা র্মা | র্মা -া র্মা -া |

| র্সা | ণা | র্সা | র্সা মা গা মা | র্মা -া র্মা -া |

| ধা | পা | ধা | পা সা সা | র্রর্সা না র্সা -া |

| মা | | মা | | মমা মা মা -া |

ন বী • ন ভা • র ত গা • হ ন বী ন সু • রে• • • •

৬ ৭ ৮ ৯ ১০

| ণধা পা ধা -া | গা ণ্া মা ঋা | পা -া -া -া | মা -া -া -া | গা -া -া গা |

| পমা রা ঋা -া | গা ণ্া ধ্া ধ্া | ণ্া | সা | ণ্া সা রা সা |

•• • • • জা • গো • জা • • • গো • • • হি • • ন্দু

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

[র্সা সা। র্সা র্সা র্সা সা]

| মা -া ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ | গাঃ মঃ পা গা | ধাঃ ণঃ র্সা ধা | র্গা -া -া -া |

| ধ্া | | সাঃ রঃ গা সা | মাঃ পঃ ধা মা | ণা |

| পা |

স্থা ন্ জা • • • গো • • • হি • • ন্দু

১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০

| র্মা ২ ৩ ৪ | ণা -া -া -া | ধাঃ ণঃ র্সা ধা | ণা -া পা -া | ধা ২ ৩ ৪ |

| মধা ণনা র্সধা র্রর্গা । পা | মাঃ পঃ ধা মা | পা -া গা -া | মজ্ঞা রসা রজ্ঞা গমা |

| মধা ণনা ধণা নর্সা | সা | সা· | রা -া সা -া । সা |

স্থা ন্ • . জা • • • গো • • • হি • • ন্দু স্থা ন্

৪

২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫
। ধা -া -া -া। ণা -া -া -া। ধা -া -া -া। র্সা ধা ণা ধা। ধা -া -া -া।
। সা । রা । সা । পা মা পা মা। মা -া ঃগঃ মা।
। ধ্া । ণ্া । ধ্া । সা সা রা সা। ধ্া -া -া -া।
ন বী ০ ন স্না ০ ৱা ত গা ০ হ ন বী ন সু ০ রে ০ ০ ০

২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ॥
। পধা পমা মা -া। ধাঃ ণঃ র্সা র্রা। র্সা -া -া -া। পা -া -া -া। ধা -া ৩৪।
। গমা রন্া সা -া। মাঃ পঃ ধা ণা। ধা । গা সা রা সা। মা ।
০ ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ গো ০ ০ ০ হি ০ ০ সু স্থা ন্ স হা

৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫
। র্মা র্সা ধা র্সা। র্মা র্গা র্মা র্পা। র্মা র্গা র্মা র্পা। র্মা র্পা র্মা র্সা। ধা -া -া -া।
। মা ধা র্সা ধা। মা গা মা পা। মা গা মা পা। মা পা ধা ণা। ।
স্না ০ ০ গ র ০ ণ ০ আ ০ জি ০ ভ ব ধা ০ মে ০ ০ ০

৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০
। স্মা -া পা -া। ধা -া -া -া। মা -া ধা -া। পা -া দা -া। মা -া ধা -া।
জা ০ ০ ০ গো ০ ০ ০ আ ০ জি ০ জা ০ ০ ০ গো ০ ০ ০

৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫
। পা -া গা -া। পা -া -া গা। মা সা রা গা } । গা র্মা -া -া। র্মা র্গা র্মা র্পা।
আ ০ জি ০ হি ০ ০ সু স্থান্ } রা ধা । র্রা র্ধা র্রা র্জা।
ণ্া মা । মা গা মা পা।
সু ধা ০ ও অ ০ ন্ধ ধা

৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০

| র্মা -া -া -া | র্জ্ঞা র্রা র্মা র্জ্ঞর্রা | র্জ্ঞা -া -া -া | র্মা র্গা র্মা র্পা | র্মা ২ ৩ ৪ |
| র্রা | র্সা না র্রা র্সনা | র্সা | র্রা র্ঋা র্রা র্জ্ঞা | র্রা |
মা জ্ঞা রা মা জ্ঞরা জ্ঞা মা গা মা পা মা
রা • • • ছ : খ জা• লা • • • ং

---

৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫

| র্জ্ঞা র্রা র্মা র্জ্ঞর্রা | র্সা ২ ৩ ৪ | র্পা র্গা -া র্সা | ণা পা গা সা | মা ধা -া র্সা |
| র্সা ণা র্রা র্সণা | ধা | | | |
জ্ঞা রা মা জ্ঞরা সা
ঘু চা ও এ ক্র • ন্দ ন গা • • •

---

৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০

| সা মা ধ্া সা | মা ধা পা মা | গা -া মা গা | রা মা জ্ঞা রা | সা ধা রা সা |
| ধা মা | | | | |
• • • ন্ বি বু ধ নি যে • বি ত স • জ্জ ন সে • বি ত

---

৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫

| মা সা রা সা | ণ্া রা সা ণা | ধা মা ণা ধা | পা সা ধা পা | সা গা ধা পা |
সু র ন র ব • ন্দি ত পু রা ণ এ ভা • র ত জা • গ রে

---

৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯

| মা সা পা গা | মা র্সা র্মা সা | র্পর্মর্গা র্মা র্মর্গর্রা র্গা | র্পর্মর্গা র্মা র্গর্রর্ঋা র্রা |
| | মা -া র্মা -া | | |
জা • গ আ বা • • র্ বি • খ • যা • সী •

৭০ ৭১ ৭২ ৭৩
র্র্সনা র্সা র্গর্র্ধা র্রা	র্র্সনা র্সা র্গর্র্ধা র্রা	র্গা -া -া -া	-া -া র্রা র্সা
		র্সা	রা সা
		ণা	
গা • • • হে • • • আ • • • জি • • • তো • • • • • মা রি

৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮
-া -া -া -া	র্সা -া -া -া	-া -া র্সা -া	র্সা র্রা র্সা	র্মা র্জ্ঞা র্রা
	ধা			
	মা			
	সা	সা -া		
• • • • না • • • • ম্ গা ও এ • ক তা • নে

৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩
| র্সা র্রা র্সা | র্মা র্জ্ঞা র্রা | র্রা র্জ্ঞা র্মা | র্মা ণা -া | র্মা -া -া র্মা |
র্ণা র্সা র্রা | র্জ্ঞা র্রা |
ণা র্সা ণা | ধা ণা |
এ • ক প্রা • ণে জা গো হি ন্দু স্থা ন্ জা • • গো

৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮
| র্মা -া র্জ্ঞা -া | র্রা -া র্সা -া | ণা -া মপধণা -া | {জ্ঞা মা -া ধা | র্সা র্জ্ঞা র্মা ধা |
জা • গো • হি • ন্দু • স্থা • • • • • ন্ গা • • হ জ য় জ য়
ভা • • র তে • র •

৮৯ ৯০ক ৯০খ ৯১ ৯২
| ণাঃ মঃ ণা র্সা | র্রা -া মপধণা -া } | র্রা -া ণা -া | মা -া -া -া | পা -া -া -া |
| | ণা } | ণা | | |
হি • • ন্দু স্থা ন্ হো ক্
ব • • শো গা ন্ গা ও জা • • • গো • • •

৯৩ ৯৪
| ধা -া -া ধা | ণা র্রা র্মা ণা II II
| | ণা মা রা ণ্া II II
হি • • ন্দু স্থা • • ন্

খাম্বাজ—পটতাল।

গান—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এস্‌ সি।

স্বরসম্বাদ—শ্রীবাণীদেবী।

এই সমগ্র স্বরসম্বাদটি

কেবল

সেতার ও অনুরূপ যন্ত্রের জন্য।

১ ২ ৩ ৪ ৫
। ধ্া সা সা সা। র্া ণ্া ণ্া ণ্া। ম্া ধ্া ধ্া ধ্া। সা সা ণ্া ধ্া। রসা ন্া সা -া।
। [illegible] । ণ্্া । স্া । ণ্া ধ্া প্া ম্া। ণ্ধ্া দ্া ধ্া -া।
ন বী • ন ভা • র ত পা • হ ন বী ন সু • রে • •

৬ ৭ ৮ ৯ ১০
। সসা ণ্া গ্া -া। গা ণ্া মা ক্ষা। পা পা পা পা। মা মা মা মা। গা -া -া গা।
। গ্ম্া ণ্্া ধ্্া -া। গা ণ্া ধ্া ধ্া। ণ্া ণ্া ণ্া ণ্া। সা সা সা সা। ণ্া সা রা সা।
•• • • • জা • গো • জা • • • গো • • • হি • • ন্দু

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
[সা সা। সা. সা সা সা]
। মা -া ৩ ৪। ১ ২ ৩ ৪। গ্াঃ ম্ঃ প্া গ্া। ধ্াঃ ণ্ঃ সা ধ্া। ণ্া সা ণ্া সা।
। ধ্া -া । । স্াঃ র্ঃ গ্া স্া। ম্াঃ প্ঃ ধ্া ম্া। প্া প্া প্া প্া।
স্থা ন্ জা • • • গো • • • হি • • ন্দু

১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০
। ধ্ধ্া ণ্ন্া সধা রগা। । ধ্াঃ ণ্ঃ সা ধ্া। প্া -া প্া -া। ধ্া ধ্া ণ্া ন্া।
। ম্ধ্া ণ্ন্া ধ্ণ্া ন্সা। । ম্াঃ প্ঃ ধ্া ম্া। র্া -া গ্া -া। ম্া ম্া প্া দ্া।
। । স্াঃ র্ঃ গ্া স্া। স্াঃ । ণ্্া -া স্া -া। স্া ।
স্থা ন্ জা • • • গো • • • হি • • ন্দু স্থা ন্

২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫

মা সা রা সা	পা ধা ণা ণা	মা -া মা মা	র্সনা র্সনা র্রা র্সা	ধপা মা গা -া
				মগা রা সা -া
				ধ্পা্ পা্ পা্ -া
		মা -া ম্া ম্া	গ্া ম্া ণ্া স্া	র্া প্া স্া -া
ন বী ০ ন ভা ০ র ত গা ০ হ ন বী ন সু ০ রে০ ০ ০ ০

২৬ ২৭ ২৮ ২৯

পধা ণনা র্সর্ধা র্রগা			
সসা ণ্া ধ্া -া	ম্াঃ প্াঃ ধ্া ণ্া	ধ্া ধ্া ধ্া ধ্া	গ্া সধা রজ্ঞা গা
গ্ম্া ণ্া স্া -া	হ্াঃ প্াঃ সা রা	সা সা সা সা	প্া সা
০০ ০ ০ ০ জা ০ ০ ০ গো ০ ০ ০ হি ০০ ০০ ন্দু

৩০ ৩১ ৩২ ৩৩

| মা ২ ৩ ৪ | র্মা র্সা ধা র্সা | র্মা র্গা র্মা র্পা | র্মা র্গা র্মা র্পা |
| ধ্া | মা ধা র্সা ধা | মা গা মা পা | মা গা মা পা |
স্থা ন্ ম হা জা ০ ০ গ র ০ ণ ০ আ ০ জি ০

৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮

| র্মা র্পা র্মা র্সা | ধা -া -া -া | জ্ঞা ধ্া রা ণ্া | সা ধ্া সা ধ্া | সা ধ্া মা ধ্া |
| মা র্সা ধা ণা |
ত ব দ্বা ০ রে ০ ০ ০ জা ০ ০ ০ গো ০ ০ ০ আ ০ জি ০

৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩

| রা ণ্া রা ন্া | ধ্া সা ধ্া সা | ণ্া রা ণ্া সা | গা সা ণ্া সা | ধ্া গা মা পা | }
জা ০ ০ ০ গো ০ ০ ০ আ ০ জি ০ হি ০ ০ ন্দু স্থান্

৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮

II ১ ২ মা সা | ১ ২ ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ |
II ধ্া স্া | | | | |
সু ছা ০ ও অ ০ শ্রু ধা রা ০ ০ ০ দু : খ জা লা ০ ০ ০

৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩
র্মা র্গা র্মা র্পা	র্মা ২ ৩ ৪	র্জ্ঞা র্রা র্মা র্জ্ঞর্রা	র্সা ২ ৩ ৪	র্সা ণা পা গা
র্রা র্ঋা র্রা র্জ্ঞা	র্রা	র্সা ণা র্রা র্সণা	ধা	
মা গা মা পা	মা	জ্ঞা রা মা জ্ঞরা	সা	
ঘু চা ও এ

৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮
| পর্সা ণধা পগা রসা | মা -া -া -া | মা -া -া -া | ম্া ম্া ণ্া ণ্া | ণ্া ণ্া ণ্া ণ্া |
| | ধ্া সা | মা ধা র্সা ধা | | |
ক্র • • • ন্দ• ন• গা • • • • • • ন্ বি বু ধ নি ষে • বি ত

৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩
| ণ্া ণ্া ণ্া ণ্া | সা সা সা সা | ম্া ম্া ম্া ম্া | ণ্া ণ্া ণ্া ণ্া | সা সা সা সা |
স • জ্জ ন সে • বি ত সু র গ ণ ব • ন্দি ত পু রা ণ এ

৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮
স্া স্া স্া স্া	স্া স্া স্া স্া	সা সা সা সা	ম্া ম্া ম্া ম্া	ধা ধা পা পা
				মা মা গা গা
				সা সা সা সা
জা • র ত জা • গ - রে জা • গ আ বা • • র্ বি • শ্ব •

৬৯ ৭০ ৭১ ৭২
| ধা ধা ণা ণা | ধা ধা ণা ণা | ধা ধা ণা ণা | স্া -া -া -া |
| মা মা মা মা | মা মা মা মা | মা মা মা মা | গা
| সা সা রা রা | সা সা রা রা | সা সা রা রা | সা
বা • সী • গা • হে • আ • জি • তো • • •

৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭

। -া -া রা সা । পা ধা ণা র্সা । স্া -া -া -া । স্া ২ সা -া । { রা রা ণ্া ।
। । গা মা পা ধা । ম্া । ম্া । মা ম্া প্া ।
। । প্া ধ্া ণ্া সা । ধ্া । ধ্া । ণ্া ণ্া ণ্া ।
। । গ্া ম্া প্া ধ্া । ধ্া । ধ্া ।
০ ০ মা রি ০ ০ ০ ০ না ০ ০ ০ ম্ গা ও এ ০ ক

---

৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২

। ণ্া ধ্া ণ্া । সা রা সা । সা সা রা । রা জ্ঞা রা । সা রা -া ॥ }
। ম্া ম্া ম্া । ধ্া ণ্া ধ্া । ধ্া ধ্া ণ্া । ম্া ধ্া ণ্া । ধ্া ণ্া -া । }
। ণ্া ণ্া ণ্া । ম্া ম্া ম্া । ম্া ম্া ম্া । ণ্া ম্া ণ্া । ম্া ম্া -া }
তা ০ নে এ ০ ক প্রা ০ ণে জা গো হি ন্দু স্থা ন্

---

৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭

। র্মা -া -া র্মা । র্মা -া র্জ্ঞা -া । র্রা -া র্সা -া । ণা -া মপধণা -া । { সা সা জ্ঞা মা ।
জা ০ ০ গো জা ০ গো ০ হি ০ ন্দু ০ স্থা ০ ০ ০ ০ ০ ন্ গা ০ ০ হ
ভা ০ ০ র

---

৮৮ ৮৯ ৯০ক ৯০খ ৯১

। ধা র্সা র্জ্ঞা র্মা । র্ণাঃ র্মঃ ণা র্সা । র্রা -া মপধণা -া { । র্রা -া ণা -া । মা পা ধা ণা ।
জ্ঞ য় জ য় হি ০ ০ ন্দু স্থা ন্ হো০০ ০ ক্ }
ভে ০ ব ০ ষ ০ ০ শো গা ম্ গা ও জা ০ ০ ০

---

৯২ ৯৩ ৯৪

। র্সা র্রা র্জ্ঞা র্মা । ধা র্সা র্মা ধা । ম্া ম্া র্া ণ্া II II
। । ধা র্সা ধা মা । ণ্া ম্া র্া ণ্া
গো ০ ০ ০ হি ০ ০ ন্দু স্থা ০ ০ ন্

একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
আশ্বিন, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

৯২৮ সংখ্যা   ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিগতাব্দ ৫০২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩।

বন্ধু আমার।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বিচ্ছেদের ভয়ে।

বন্ধু হে! তোমাকে ভালবাসিয়া আমি বড়ই সুখে আছি, বড়ই আনন্দে আছি। কিন্তু অত সুখে আছি বলিয়াই হৌক, বা যে কারণেই হৌক, আমার প্রাণটা সমস্তক্ষণই দুরু দুরু কাঁপে—জানি না কেন, সর্ব্বদাই যেন ভয় হয় যে, কেহ বুঝি তোমা হইতে আমাকে দূরে সরাইয়া ফেলিবে। এই যে জ্যোৎস্নারাত্তে সমস্ত ধরণী হাসিতেছে, এই যে মলয় বাতাস প্রাণের উপর ঘুমের আবেশ আনিয়া দিতেছে, এই যে পাখীরা গভীর রাত্রে সহসা কি জানি কেন অস্ফুট ধ্বনিতে ডাকিয়া উঠিতেছে, আর, তোমার হাতে হাত দিয়া আমি সেই ধ্বনির মধ্যে অসীমের কি এক সুর শুনিয়া আনন্দে যে বিহ্বল হইতেছি—মনে হইতেছে, আমি যেন তোমার নিকট হইতে নিকটতম হইয়া পড়িয়াছি—ভয় হয়, কে যেন তোমার আর আমার মাঝে বিচ্ছেদের আগুন জ্বালাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, মরণের বাতাস আনিয়া আমাদের এত প্রেম এত ভালবাসা ছিন্নভিন্ন করিবার উদ্যোগ করিতেছে। দেখো বন্ধু! দেখো—যদি কখনও মরণ আমাকে তোমা হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে চায়, দেখো, তুমি তখন তোমার ঐ করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আমাকে তোমার কাছে ডাকিয়া লইও; তোমার সবল হাত আমার দিকে বিস্তারিত করিয়া দিও এবং আমাকে মরণের হাত হইতে তুলিয়া ধরিও। মরণ যবে আমায় ঘিরিয়া ফেলিবে, তখন বন্ধু হে! তোমার এই বন্ধুকে জীবন দিয়া বন্ধুতার পরিচয় দিও। আমায় তুমি সাহস দাও—আমার প্রাণের এই কাঁপুনি দূর হউক।

দুই সখা।

বন্ধু আমার! আমি যখন কর্ম্মক্ষেত্রের দারুণ পরিশ্রমের পর গৃহে ফিরিয়া আসি, তখন তোমায় দেখিবার জন্য প্রাণটা বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠে। কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়া যখন কর্ম্মের মধ্যে ডুবিয়া থাকি, তখন অনেক সময়েই তোমাকে মনে আনিতে পারি না। কেবল মধ্যে মধ্যে তোমার প্রসন্ন মুখের হাসি প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া কঠোর পরিশ্রমের ভিতরেও শান্তি আনয়ন করে, আর শরীরে ও মনে নববলের সঞ্চার করে। কিন্তু গৃহে ফিরিয়া আসিলে আর এক মুহূর্ত্তও তোমাকে ছাড়িয়া আমার প্রাণ তিষ্ঠিতে চায় না। তখন তুমি এক মুহূর্ত্তেরও জন্য চক্ষের আড়ালে থাকিলে প্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতার হাহুতাশের ঝড় বহিয়া যায়। তখন ইচ্ছা হয়, সমস্তক্ষণ তোমার হাতে হাত দিয়া, তোমার বুকে মাথা রাখিয়া প্রেমিকযুগল সাজিয়া বসিয়া থাকি, আর ঐ মত পরস্পরের প্রতি প্রেমভরা দৃষ্টিতে সমস্তক্ষণ চাহিয়া থাকি—দেখি—কত বিহগ-বিহগী আনন্দমনে কলতান করিতে করিতে হাল্কা

বাতাসের উপর ভর করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে; দেখি, কত কীটপতঙ্গ পদতলে ধরণীতে তৃণ হইতে তৃণান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; দেখি, কত বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি ফুল হইতে ফুলে পরাগে মাথামাখি হইয়া আমাদের গায়ের উপর বসিতেছে। কোথাও যদি কোন পাখী ডাকিয়া উঠে, মনে হয়, তোমারই মধুর ডাক শুনিয়া বুঝি সে সাড়া দিতেছে। বন্ধু! এইটুকু আমার প্রতি দয়া কর, গৃহে ফিরিলে যেন তোমার নিত্য দর্শন পাই—এক মুহূর্ত্তও আমার চক্ষের আড়ালে থাকিও না। আমরা দুইজনে একসঙ্গে বসিয়া পরস্পর পরস্পরের মন হরণ করিবার খেলা খেলিব—দেখিব, কে হারে আর কে-ই বা জয়লাভ করে। অপর কাহাকেও শুনাইবার জন্য আমার কথা আর রাখি নাই—আমি বলিব, তুমি শুনিবে; তুমি বলিবে, আমি শুনিব। আমার কথা, আমি জানি, একমাত্র তোমারই ভাল লাগিবে। অন্য লোকে আমার কথা শুনিয়া দুই মুহূর্ত্তের জন্য ভাল বলিবে বা নিন্দা করিবে বা উপহাস করিবে,—আমার তাহাতে কিছুমাত্র আসিয়া যায় না। তুমি যদি আমার কথা, আমার কার্য্য ভাল বল, তাহা হইলেই বন্ধু! আমার—কি বলিব তোমায়—আমার সকলই সার্থক, আমার অনন্ত জীবন সার্থক। এইটুকু আমার মনে শক্তি দাও—যেন, তোমার নিকটে আমার লজ্জাসরম কিছুই না থাকে; এমন কোনই কাজ না করি, যাহা তোমার নিকটে বলিতে গিয়া দুই মুহূর্ত্ত থমকিয়া দাঁড়াইতে হয়। তুমি আমাকে এইটুকু আশ্বাস দিয়া বল যে, তুমি আমার তনমনধন সকলই স্নেহ হস্তে গ্রহণ করিয়াছ। বল একবার হৃদয়বন্ধু! এবং আমাকেও প্রাণ খুলিয়া বলিতে দাও—তুমি আমার, আমি তোমার—তুমি আমার, আমি তোমার।

শান্তিপ্রার্থনা।

বন্ধু! যেখানেই যাই, যে অবস্থায় থাকি, তোমারই প্রসন্নমুখের হাসি সর্ব্বদাই প্রাণের ভিতর জাগিতে থাকে। আহারে-বিহারে তোমারই মুখ জাগিয়া উঠে। আমার চক্ষু হইতে তুমি নিদ্রা কাড়িয়া লইয়াছ। দিনরাত—দিনরাত—তোমাকে ছাড়িয়া আমি এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারি না। তোমার আদেশে দিবসে যখন কর্ম্মের ঘূর্ণায় মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাই, তখন তোমার ঐ মুখ, তোমার ঐ নয়ন সমস্তক্ষণ আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাকে উৎসাহিত করে; নিমেষের মধ্যে আমার শ্রান্তি ক্লান্তি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। নিরাশা নিরানন্দ প্রভৃতি সপ্তরথী আমাকে যখন ঘিরিয়া ফেলে এবং আমাকে যাঁতায় পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে, তখন তো দেখি, তুমি নিজেই কোথা হইতে আসিয়া আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছ। তখন দেখি, তোমার এক এক হুঙ্কারে সেই সমস্ত মহাবল শত্রুরাও সহসা কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। তখন তোমার উৎসাহবাণীতে উৎসাহিত হইয়া আমি সবলে শত্রুপক্ষের পরাজয়সাধনে সক্ষম হই। বন্ধু! তোমারই আদেশে আমি দিবসে কর্ম্মক্ষেত্রে যাই, কর্ম্ম করিতে করিতে শতবিধ প্রকারে কর্দ্দমাক্ত হই। তোমাকে সে বিষয়ে কতই বলি, কতই অনুযোগ করি; কিন্তু তুমি তো সে সকল প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিতেই চাও না। যাই হৌক, তোমারই আদেশে যখন কর্ম্মে নামিয়া কর্দ্দমাক্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসি, তখন দেখো, হে বন্ধু! আমাকে অপরিচিতের ন্যায় গৃহদ্বার হইতে সরাইয়া দিও না; তখন তোমার পূর্ণ কলস হইতে একটুখানি শান্তিজল দিয়া আমাকে শ্রান্তিক্লান্তি এবং সর্ব্বাঙ্গ হইতে কর্দ্দমরাশি দূর করিবার অবসর প্রদান করিও। আমার এই প্রতিজ্ঞা—তুমি আমাকে শতবার বিদূরিত করিলেও আমি তোমার ঐ চরণ ধরিয়া পড়িয়া থাকিব। বিদূরিত করিবার কথা বলিতেছি কেন? তুমি কি তোমার এই সর্ব্বস্বহারাগো বন্ধুকে ক্ষণেকের জন্যও তোমার চক্ষের অন্তরালে রাখিতে পার? আমার ভালবাসায় আর তোমার ভালবাসায়,—আমরা দুইজনে যে সম্পূর্ণ এক হইয়া গিয়াছি—মাঝে তো আর কোনই ব্যবধান নাই! সংসারে অনেক কাল তোমার কার্য্যই করিতেছি ভাবিয়া অনেক বৃথা কার্য্যেই ঘুরিয়া মরিয়াছি। সেই কার্য্যসূত্রে, বালক-বালিকারা যেমন সিন্ধুসৈকতের উপর হইতে ঝিনুক শামুক কুড়াইয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠে, সেইরূপ আমিও আনন্দে অধীর মনে রাশি রাশি ইটপাথর সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। সংসারে যাহার ইচ্ছা, সেই সমস্ত

ইটপাথর লইয়া খেলা করুক; আমার আর সে খেলা করিবার সময় নাই। এখন আমার যাহা কিছু খেলা, তাহা তোমারই সঙ্গে। তুমি হইতেছ শান্তিসমুদ্র। আমি অবাক হইয়া যাই—চারিদিক হইতেই তো অশান্তির ধ্বনি তোমার কানে গিয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই পৌঁছিতেছে; তাহার মধ্যে তুমি কি প্রকারে তোমার সুগম্ভীর শান্তি রক্ষা কর? বন্ধু! আমাকে তোমার ঐ শান্তির একবিন্দু দাও, আমার হৃদয় হইতে সমস্ত অশান্তি দূর হোক, আমার চিত্ত শান্ত হউক।

বিরহের ফলে।

বন্ধু! মুহূর্ত্তের জন্য তোমাকে হারাইয়া, তোমাকে দেখিতে না পাইয়া জীবনে যে কি অশান্তি ভোগ করিয়াছি, তাহা তুমি যদি অন্তরে অনুভব না করিয়া থাক, তবে তোমাকে তাহা কি প্রকারে জানাইব, তাহা জানি না। এসো—বন্ধু—তুমি আসিয়াছ—আমার সকল অশান্তি বিদূরিত হইয়াছে। একবার তুমি তোমার প্রাণভরা গাঢ় আলিঙ্গন আমাকে দাও, আর সুখের সাগরে আমাকে ডুবাইয়া দাও। চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্র, সকলেরই সুখের মধ্যে আমি যেন ডুবিতে পারি; বাতাস করুণ সুরে তোমার যে নামগান করে, তাহারও মধ্যে যেন আমি ডুবিতে পারি। আহার-বিহার শয়নজাগরণ, সকলের ভিতর তোমাকে নিকটে পাইয়া যেন নিরাবিল সুখের মধ্যে ডুবিয়া যাই। আমি আর আপনার ভিতরে আপনি লুকাইয়া থাকিতে চাহি না। আমি চাই—তোমার ভিতরের ভিতরে মিশিয়া যাইতে। আমি চাই—আমার ভিতরের ভিতরে তোমাকে লুকাইয়া রাখিতে। তোমাকে হারাইয়া কত স্থানেই যে ঘুরিলাম, কোথাও তো সুখ পাইলাম না, শান্তি পাইলাম না—প্রাণের মধ্যে জ্বালাযন্ত্রণা বাড়িতেই লাগিল। আজ শেষে তোমাকে পাইয়া, তবে আমার সেই অশান্তি, প্রাণের উদ্বেগ দূর হইল; প্রাণের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার হইল, নববসন্তের বাতাস বহিল। তোমাকে মুহূর্ত্তের জন্য হারাইয়া একরকম ভালই হইয়াছে—তুমি আমার কি প্রকার বন্ধু, তাহা আমি চিনিতে পারিয়াছি। তোমার জন্য আমার প্রাণের ভালবাসার গভীরতা বুঝিয়াছি। আমার জন্যও তোমার গভীর ভালবাসা বুঝিতে পারিয়াছি। আগে ভাবিতাম, তোমার কত—কত বন্ধু আছে; আমি তোমার উপেক্ষার বস্তু—আমি দূরে সরিয়া গেলে, কোন্ অকূলে ভাসিয়া গেলে তোমার বড় কিছু আসিয়া যায় না। এখন বুঝিয়াছি, আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম; এখন দেখিতেছি, তুমি যেখানেই থাক, যে কর্ম্মযজ্ঞেরই অনুষ্ঠান কর, তোমার প্রাণটা আমার দিকেই পড়িয়া থাকে। আমি যখন দুঃখের অন্ধকারে ডুবিয়া যাই, তখন সহসা কোথা হইতে তোমার মুখের জ্যোতি আমার প্রাণে আসিয়া পড়ে, আর সমস্ত অন্ধকার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আর আমি সুখের আশা করি না—সুখ দাও, ভালই; না দাও, তাহাও ভাল। আমি কেবল চাই এখন তোমাকে লইয়া দুই দণ্ড নির্জ্জনে বসিতে, নির্জ্জনে ঘুরিতে, নির্জ্জনে বিনা ভাষায় মুখোমুখি চাহিয়া আলাপ করিতে। কত জন্ম ধরিয়া জানি না, ভালবাসা মনে করিয়া মায়া-মরীচিকার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইয়াছি। আজ আমার সে ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—আজ আমি তোমার সত্য ভালবাসা পাইয়াছি; আর মনে হয়, আমিও তোমাকে আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের হইলেও সত্য ভালবাসা অন্তত এতটুকু দিতে পারিয়াছি। আজ তোমার শরণ লইবার অধিকার লাভ করিয়াছি; আজ আমি অকূলের কূলের সন্ধান পাইয়াছি। আজ আমি সর্ব্বত্র তোমারই সুরভি নিশ্বাস অনুভব করিতেছি, সর্ব্বত্র তোমারই মধুর বাণী শ্রবণ করিতেছি।

কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্গী।

বন্ধু! কর্ম্মক্ষেত্রে যাইতে হইবে। তোমার আদেশ! তুমিও যাইবে কর্ম্মক্ষেত্রে। বড় কষ্ট—বড় কষ্ট—হৃদয় অশান্তিতে ভরিয়া যাইতেছে। কর্ম্ম করিবার সময় তোমাকে যে অনেক সময় মনে পড়ে না—সেইটাই আমার বড় কষ্ট; যখনই মনে পড়ে, তোমার কথা ভুলিয়া গিয়াছি, তখন মনটা ভয়ে ত্রাসে কম্পিত হইয়া উঠে, দুঃখে ঘৃণায় ও লজ্জায় হৃদয় ম্রিয়মাণ হইয়া উঠে। না—বন্ধু—না—তোমাকে মুহূর্ত্তেরও জন্য বিদায় দিতে পারিব না। আমারই সঙ্গে তুমি চল; আমি যেখানে কর্ম্ম

করিব, তুমিও সেইখানে আমার চোখে-চোখে থাকিয়া কর্ম্মক্ষেত্র খুলিয়া দিও, আর তোমার সেই ক্ষেত্রে আমিও কর্ম্ম করিব—কি করিতে হইবে না-হইবে তাহা আমাকে তুমি দেখাইয়া দিও। সংসারের জ্বালাযন্ত্রণায় আমার প্রাণ তো ইতিপূর্ব্বে খালি হইয়া গিয়াছিল। তোমার কাছে আসিয়াছিলাম—তোমার প্রেমসুধায় সেই প্রাণ ভরিয়া লইবার জন্য। এখন যদি আমায় তোমাকে বিদায় দিতে হয়, তবে তো সেই খালি প্রাণ বিষাদে পুড়িয়া খাক হইয়া যাইবে। প্রাণের ভিতর হইতে কাতর সুরের যে গান বাহির হইবে, বন্ধু। তোমার কি তাহাই এত ভাল এত মিষ্ট লাগে? তাই কি তুমি বিদায়ের কথা বলিয়া আমার প্রাণের সমস্ত আনন্দ মুহূর্ত্তের মধ্যে মিলাইয়া দিতে চাও? সমস্ত সংসার ঘুরিয়া দেখিয়াছি—বৃথা ঘুরিয়া মরিয়াছি—হে আমার প্রাণের বন্ধু!—যাহার হাতে আমার সমস্ত প্রাণটা নিঃসঙ্কোচে দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি, এমন বন্ধু তো দেখিলাম না। সহসা তোমার সঙ্গে কি শুভ মুহূর্ত্তে দেখা হইল, আর আমার প্রাণের সমস্ত জ্বালা যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে জুড়াইয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই বুঝিলাম, তুমি আমাকে ধরিবার জন্য কত না যত্ন ও চেষ্টা পাইয়াছ, কত স্থানে কত প্রত্যাখ্যানই না সহ্য করিয়াছ, কিন্তু ধরিবার আশা কখনও পরিত্যাগ কর নাই; আমিও যেন তোমাকেই কত দেশদেশান্তরে কত যুগযুগান্তর ধরিয়া খুঁজিতেছিলাম; কতবার তোমাকে পাইয়াছি পাইয়াছি মনে হইলেও পাই নাই। শেষে যে দিন সংসারের কাঁটার আঘাতে দেহ মন ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, তোমার চরণে দাঁড়াইবার জন্য প্রাণটা যখন ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল, তখনই দেখি, তুমি আমার গায়ের কাছে দাঁড়াইয়া আছ; তখনই বুঝিলাম, আমিও যেমন তোমার প্রেমে ধরা পড়িয়াছি, তুমিও তেমনি আমার প্রেমে ধরা পড়িয়াছ। আমি তো অকূল সাগরে এই শীর্ণ দেহের জীর্ণ তরী ভাসাইয়া দিয়াছি—তোমাকেই সেই জীর্ণতরীর কর্ণধার করিয়া বেশ নির্ভয় হইয়া আছি। আর আমার কাছে তুমি বিদায় চাহিও না, আমিও যেন এক মুহূর্ত্ত তোমাকে ছাড়িয়া না থাকি। সংসারের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া প্রাণের ভিতর সর্ব্বদাই ভয় হয়, পাছে ছাড়াছাড়ি হইলে পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানটা ক্রমেই বাড়িয়া যায়। এখন বন্ধু! সংসার হইতে আমি মুছিয়া গেলেও কাহারও প্রাণেই আর ব্যথা লাগিবে না—তাহারা আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে; যাহারা ভুলিয়া যায় নাই, তাহারাও কালক্রমে ভুলিয়া যাইবে। নববসন্তের নূতন বাতাস যখন তাহাদের গায়ে আবার লাগিবে, তখন তাহারা আবার হাসিবে, আবার তাহারা নূতন নূতন গান গাহিতে থাকিবে। হয়ত বা মধ্যে মধ্যে তাহাদের সেই আনন্দের মধ্যে আমার কথা বিষণ্ণচ্ছায়ার মত আসিয়া দাঁড়াইবে এবং তাহারা তৎক্ষণাৎ মন হইতে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু—তুমি—বন্ধু—তুমি—বহুকাল তোমাকে আমি ভুলিয়া থাকিলেও তুমি আমার চিরন্তন বন্ধু! আমার সুখ, আমার দুঃখ—এ সমস্তই যেন তুমি তোমার বলিয়াই অনুভব কর। বন্ধু! তুমি আমার নিত্যসাথী—তুমি আমার চিরসঙ্গী।

আশ্বাস বাণী।

বন্ধু! আজি তুমি আমার প্রাণের কথা শুনিয়াছ। আজ তুমি আমায় কি মধুর আশ্বাসবাণী শুনাইলে যে, তুমি আমাকে আর চক্ষের আড়াল হইতে দিবে না! আজ আমার মহা আনন্দ। আজ মলয় বাতাস কত গাহিতেছে গান। আজ চারিদিক হইতে শত সুরভি ফুলের সুবাস আমার ভরিয়া দিতেছে প্রাণ। সমস্ত জীবন ভরিয়া যৌবনের পুলক উঠিছে জাগিয়া। বন্ধু! তুমি এই ঘনচ্ছায় বৃক্ষতলে, এই সুরভিত বীথিকায় আমাকে একবার গাঢ় আলিঙ্গন দাও। তোমার সেই আলিঙ্গন আমার অন্তরে চিরমুদ্রিত হইয়া থাকিবে। তোমার সেই নিশ্বাস আমার অনন্ত জীবনের পাথেয় হইবে। চাঁদের জ্যোৎস্না যখন ধরাপৃষ্ঠ ধবলিত করিবে, তখন আমি সেই জ্যোৎস্নার ভিতরে ডুবিয়া থাকিব, আর আমার মুখের উপর তোমার সেই নিষ্কলঙ্ক মুখের জ্যোৎস্না অনুভব করিব। তটিনী-সৈকতে বসিয়া যখন দেখিব, সে কুলুকুলু ধ্বনিতে কি গান গাহিয়া কোন্ সাগরপানে বহিয়া চলিয়াছে, তখন সেই ধ্বনির ভিতরে তোমারই অতি মৃদুলমধুর বাণী শুনিতে থাকিব। প্রাণে যখন বড়ই অশান্তি আসিবে, তখন তোমার ঐ গাঢ় আলিঙ্গনের স্মৃতি

প্রাণের মাঝে শান্তিধারা বর্ষণ করিবে। বন্ধু! আমি যখন আমার এই দুইটী ক্ষুদ্র বাহু বাড়াইয়া তোমাকে কাতর হৃদয়ে আহ্বান করিব, তখন যেন অন্য কোথাও থাকিও না; তখন তুমিও তোমার ঐ দুই বরাভয়প্রদ বাহু দ্বারা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আমাকে ভয়ত্রাস হইতে মুক্ত করিও। আমার প্রেম যখন তোমার দিকে ছুটিয়া যাইবে, তখন আমার সেই প্রেমকে ব্যর্থ করিও না; তোমারও প্রেমের ধারা নামাইয়া আমাকে কুসুম-কোমল বজ্রকঠিন বাঁধনে বাঁধিয়া ফেলিও।

আজ আমার কাছে সকলই সুন্দর, সকলই মধুময়। আমার ভাগ্যে তোমার যে বিরহ ঘটিয়াছিল, তাহাও আজ আমার মধুর মনে হইতেছে—সেই বিরহেরই ফলে আজ তোমার সঙ্গে আমার মিলন লাভ ঘটিয়াছে। আজ বন্ধু! আমি যেমন তোমাকে আমার কাছে পাইয়া আনন্দে কি যে হইতেছি তাহা বলিতে পারি না, তেমনি তুমিও ঠিক করিয়া বল দিকিন, তুমিও আমাকে সম্পূর্ণভাবে পাইয়া মহা আনন্দে আনন্দিত হইতেছ কি না? তোমার ও আমার মধ্যে আজ যে প্রেমের বন্ধন পড়িল, সে বন্ধনের আর শেষ নাই। মনে হইতেছে, যেন কত অনাদিকাল পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে আমার এই বন্ধন ছিল— তাহাই যেন আজ নবীন ভাবে আমার প্রাণে মুকুলিত হইয়া উঠিল।

আজ আমাদের এই মিলনের সাক্ষী তোমারই এই চন্দ্র, তোমারই এই গ্রহতারকা। আমাদের এই মিলনের কাহিনী আজ দিকে দিকে ঘোষণা করিবার জন্য তোমারই এই মলয়বায়ু ছুটিয়া চলিয়াছে এবং তাহারই আনন্দে আজ এই কাননের নানা স্থান হইতে কোকিলেরাও কুহুতান তুলিয়াছে; ঝিঁঝি পোকারা এক অপূর্ব্ব বাঁশীর সঙ্গত বসাইয়া দিয়াছে। আজিকার এই মিলনে আমার এত আনন্দ হইতেছে যে, আমার উহাকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে ভয় হইতেছে। মাঝে মাঝে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ভাবি—বুঝি বা ইহা স্বপ্ন—আমার মনেরই বা ভ্রম! না—না—তাহা ভাবিবার আর অবসর নাই—তোমার ঐ আলিঙ্গনের স্মৃতি তখনই আসিয়া প্রাণে সবল আঘাত করে, আর আমার সমস্ত ভুল ভাঙ্গিয়া যায়, বিষাদ দূরে পলায়ন করে।

বন্ধু! আর আমি নিজের ভাবনা ভাবিব না—আমার যাহা আবশ্যক, তাহা তোমাকে বলিব মাত্র। তুমি আমার যাহা ভাল বুঝিবে, তাহাই দিও। আমার দেহমন সমস্তই তোমারই হস্তে সমর্পণ করিলাম। তুমি আমাকে যে দিকে চলিতে, যে কার্য্য করিতে আদেশ করিবে, আমি সেই পথে চলিব, সেই কাজই করিব। আমি পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট শুনিয়া আসিয়াছি যে, তোমার উপর জীবনের ভার দিলে নাকি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, শান্তি পাওয়া যায়; তুমিই নাকি তাহার সমস্ত সংসারভার বহন কর। বন্ধু! আমি ঐ শান্তি পাইবার জন্য, ঐ নিশ্চিন্ত হইবার জন্য একনিষ্ঠ হৃদয়ে তোমারই শরণ লইলাম—তুমিই আমার সংসারের যোগক্ষেম বহন করিয়া আমাকে শান্তি দাও—তোমার বুকে মাথা দিয়া এই সুবিমল নিশীথে এই সুরভিত স্থানে প্রশান্ত হৃদয়ে একটুখানি ঘুমাইতে দাও। "তেষাং অনন্যযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং" তোমারই এই সরল মধুর বাণী আমার নিকট সম্পূর্ণ সফল হোক।

ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু।

ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির বঙ্গে আগমনের কারণ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ ৯৯৯ সম্বতে বঙ্গদেশে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আগমনকাল লইয়াও যেমন নানা মতভেদ দেখা যায়, সেইরূপ তাঁহাদের আগমনের কারণ লইয়াও মতভেদ আছে।

১০। বাজপেয় যজ্ঞ।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ি মহাশয় তাঁহার "ভারতবর্ষ" গ্রন্থে বলেন যে, দুর্গামঙ্গলের মতে অনাবৃষ্টিনিবারণকল্পে 'বাজপেয়' যজ্ঞ সম্পাদনার্থ পঞ্চব্রাহ্মণ আনীত হন (১)। আমরা কিন্তু সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত দুর্গামঙ্গল গ্রন্থে এবিষয়ে কোন কথাই দেখিতে পাই নাই। মৃত্যু-

(১) পৃথিবীর ইতিহাস—ভারতবর্ষ ৭ম খণ্ড—২৪৫পৃ পাদটীকা।

ঞ্জয় শর্ম্মার রাজাবলী গ্রন্থেও এই কারণই উল্লিখিত হইয়াছে (১)। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের আদিবংশ লেখক ও কুলশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ৺শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পুস্তিকাতে বলেন যে "জনশ্রুতি এই যে, 'আদিশূরনামে বঙ্গদেশে রাজা ছিল। অনাবৃষ্টিহেতু পঞ্চব্রাহ্মণ আনিল'।" (২) কিন্তু আমরা কোনও বিশ্বাসযোগ্য কুলগ্রন্থে এই কারণের উল্লেখ দেখি না। আর যদি বা সেরূপ কোন ঘটনা ঘটিয়াও থাকে, তাহাও আদিশূরের সময়ে হইয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। জনশ্রুতিমূলক উপরোক্ত কারিকাতেও কোন্ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ আদিশূরের পিতৃপিতামহ কাহারও কর্ত্তৃক অনাবৃষ্টিনিবারণকল্পে কোন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সেই কারণে কোনও পঞ্চব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সেই কথাই উক্ত কারিকাতে ধ্বনিত হইয়াছে।

২১। প্রাসাদে গৃধপতন ?

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, "আদিশূরের প্রাসাদের উপর এক গৃধ্র পড়িয়াছিল। রাজা ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া স্বদেশের পণ্ডিতদিগকে এক সভায় আহ্বান করিয়া অমঙ্গলশান্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিতেরা সেই গৃধ্রকে ধরিয়া তাহারই মাংসে হোম করাই একমাত্র উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন। তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন— সেই গৃধ্রকে ধরিবার উপায় কি ? সভাস্থ পণ্ডিতগণ সকলেই নিরুত্তর। সভাস্থ এক ব্রাহ্মণ অনতিপূর্ব্বেই কান্যকুব্জ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনিই সভার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নিবেদন করিলেন—"মহারাজ, আমি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে কান্যকুব্জ গিয়াছিলাম। সেখানেও রাজবাটীতে এক গৃধ্র পড়িয়াছিল। কান্যকুব্জরাজ ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া তাঁহাদের দ্বারা সেই গৃধ্রকে মন্ত্রবলে ধরাইয়া তাহারই মাংসে হোম করাইয়াছিলেন, ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আপনিও সেই ভট্টপ্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া সেই কার্য্য করান।" ইহা শুনিয়া আদিশূর সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে দূত পাঠাইয়া ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড় ও বেদগর্ভ নামক সাগ্নিক পঞ্চব্রাহ্মণকে সপত্নীক ও যজ্ঞোপকরণসহ এদেশে আনাইয়া পূর্ব্বাবধি রচিত স্থানে বহুমানপুরঃসর বাস করাইয়াছিলেন (৩)।

২২। আখ্যায়িকাসম্বন্ধে মন্তব্য।

এই আখ্যায়িকা হইতে দেখা যায় যে, ভারতের দেশ হইতে দেশান্তরে ব্রাহ্মণাদির অবাধ যাতায়াত বন্ধ ছিল না। গৃহের উপরে গৃধ্রপতন এখনকার মত তখনও গুরুতর অমঙ্গলের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত দেখা যায়। এই আখ্যায়িকাতেই তো দেখা যায় যে, কান্যকুব্জরাজসম্বন্ধেও গৃধ্রপতনের এক আখ্যায়িকা সংযুক্ত করা হইয়াছে। আবার ১০০১ শকে বা ১১৩৬ সম্বতে আর একদল পঞ্চগোত্রের পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের কারণস্বরূপে সম্ভবত বঙ্গদেশের বা বারেন্দ্রভূমির কোন এক অংশের অধিপতি শ্যামল বর্ম্মার সঙ্গে গৃধ্রপতনের এইরূপ একটী আখ্যায়িকা সংযুক্ত করা হইয়াছে (৪)। ইতিপূর্ব্বে আমরা ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি যে, সম্ভবত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি আদিশূর সম্ভবতঃ রাজসূয়সদৃশ কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকিবেন। আমাদের অনুমান হয় যে, গৃধ্রপতন জন্য যদি বা কোন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে তাহা ঐ বৃহত্তর যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের দ্বারা উহার পূর্ব্বেই গৃধ্রপতনজন্য যজ্ঞকার্য্য শেষ করা হইয়াছিল। আমাদের কিন্তু মনে হয় যে গৃধ্র

(১) রাং রাং পৃঃ ৭

(৩) ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং—পৃঃ ১২

(৪) * * * গৌড়েশ্বরঃ শ্যামলবর্ম্মসংজ্ঞ ॥ * * *
ততঃ কদাচিদ্রাজসৌধভাগে প্রপাতিগৃধ্রাদতিবিগ্নমানস।
স কারয়ামাস বিবিধপ্রকারৈঃ শান্তিং দ্বিজৈস্তস্য গৌড়সংস্থৈঃ ॥
তথৈবশান্ত্যা ন হি শান্তিরাসীদুপপ্লবা ঘোরতরা বভূবুঃ।
দৃষ্ট্বা তদাতঙ্কিতহৃৎ প্রিয়ামাচক্ষিবান্ সর্ব্বমসহাকষ্টঃ ॥
সোবাচ রাজ্ঞে পিতৃসন্নিধানাৎ ক্ষিপ্রং দ্বিজং সাগ্নিকমানয় ত্বং।
যতো ন শান্তির্হ্যবান্নরগ্নিবিপ্রৈঃ কৃত সৈব ভবেৎ প্রশস্তা ॥
ততঃ স রাজা হিতবীক্ষমাণো গত্বা তয়া তৎ শ্বশুরে নিবেদ্য।
সংবৎসরং তৎপিতৃতুষ্টিহেতোঃ নিবাসয়ামাস দ্বিজং হি নিষ্প্রঃ ॥
তস। ব্রতস্বস্তায়নোৎসবায় বিধিং বিধজ্ঞঃ পরিয়াজনায়।
আদেশয়ামাস সভামভিজ্ঞঃ স্ববিপ্রপুঞ্জাং শ্রুতিপাঠশীলং ॥
* * যশোধরং শৌনকগোত্রসম্ভবং ॥
* * * *
শাকেন্দুনে শূন্যবিধৌ শকাব্দে বৈশাখমাসস্য স্থিতে দশম্যাং।
প্রহৃষ্টচিত্তেন নৃপেণ সার্দ্ধং যশোধরঃ শৌনকগোত্রসম্ভবঃ ॥
পাঠান্তর—যশোধরঃ কুন্তলদেশমাগতঃ। সং নিং ২০০ পৃঃ
সামন্ত চূড়ামণি মুখনির্গত তাম্রশাসনস্থ শ্লোক—সং নিং ৫০ পৃঃ.

(২) ঐ

পতনের জন্য কোন যজ্ঞই অনুষ্ঠিত হয় নাই। সম্ভবত কান্যকুব্জরাজ ঐরূপ একটা যজ্ঞ করিয়াছিলেন; তাঁহার সঙ্গে সমকক্ষতা দেখাইবার জন্যই ঐরূপ একটা যজ্ঞানুষ্ঠান আদিশূরের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হইল; আবার পরে তাঁহার সঙ্গেও সমকক্ষতা দেখাইবার জন্য অন্যতর রাজা শ্যামলবর্ম্মার পারিষদগণ তাঁহারও স্কন্ধে ঐরূপ একটা যজ্ঞানুষ্ঠান চাপাইতে বিরত হইলেন না। আমাদের এরূপ অনুমান করিবার কারণ এই যে, কোনও প্রামাণিক কুলগ্রন্থে আমরা এই আখ্যায়িকা উল্লিখিত দেখি না।

১০। ভগবৎপ্রীতি?

দুই একটী কুলগ্রন্থে দেখি যে, ভগবৎপ্রীতি সাধনের ইচ্ছায় আদিশূর একবার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহার সভাস্থ পণ্ডিতেরা তৎসাধনে অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। তখন আদিশূর শ্বশুর বীরসিংহের নিকট হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনাইয়া লয়েন (৫)। এই ঘটনা যদি সত্যই ঘটিয়া থাকে, তবে তাহাও সম্ভবত সম্বত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি অনুষ্ঠিত কোন বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠানের সমসময়েই ঘটিয়া থাকিবে—যে সময়ে আদিশূর গৌড় জয় করিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন; অথবা কান্যকুব্জজয়ে যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভগবানের প্রীতিসাধনের জন্য ছোটখাটো যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং গৌড়জয়ের পর রাজসূয়সদৃশ এক বিরাট যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যাই হৌক্, মোটের উপর মনে হয় যে, এই ঘটনা যদি প্রকৃত হয়, তবে তাহা দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি ক্ষিতীশ প্রভৃতির দ্বারাই সংসাধিত হইয়াছিল। "ঠাকুর পরিবারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ" পুস্তিকায় আছে যে, প্রজাগণের মধ্যে অধর্ম্মের (সম্ভবত বৌদ্ধধর্ম্মের) প্রসার নিবারণকল্পে যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য বীরসিংহের নিকট হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন (৬)। ইহাও উপরোক্ত প্রবাদের প্রকারান্তর বলিয়াই মনে হয়।

১৪। চান্দ্রায়ণ ব্রতের জন্য?

বারেন্দ্রকুলাচার্য্যদের মতে আদিশূরপত্নী চন্দ্রমুখী একবার চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠানে কৃতসংকল্প হন; সেই ব্রত সম্পাদনের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ সমস্ত গৌড়রাজ্যে না পাওয়ায় আদিশূর কান্যকুব্জদেশ হইতে পাঁচ গোত্রের পাঁচ ব্রাহ্মণ আনান। কিন্তু ইহাঁদের মতে পূর্ব্বোক্ত কৌশিক প্রভৃতি গোত্রের পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। আমাদের মতে, মাত্র এই পাপক্ষয়সাধক চান্দ্রায়ণব্রত সম্পাদনের জন্য ঘনঘটার সহিত অন্য রাজ্য হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠানো সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে, কুলগ্রন্থে উক্ত আছে যে, এই পঞ্চব্রাহ্মণ একসঙ্গে একযোগে আসেন নাই; কিন্তু আজ একজন, কিছুকাল বাদে আর একজন, আরও কিছুকাল বাদে আর দুইজন, এই ভাবে ক্রমে ক্রমে আসিয়াছিলেন। সুতরাং মনে হয় না

(৫) এতৈঃ সহ মহীপাল একদা স নিজালয়ে।
উপবিষ্টো দ্বিজান্ প্রষ্টুং ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণঃ ॥ ৩
কেন যজ্ঞেন ভগবৎপ্রীতির্ভবতি নিশ্চিতং।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়ধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪
ইতি শ্রুত্বা দ্বিজাঃ সর্ব্বে খর্ব্বীকৃতকলেবরাঃ।
কথয়ন্তি নৃপাগ্রে তু সর্ব্বে নিবৃত্তমানসাঃ ॥ ৫
কেন কেন বিধানেন যজ্ঞো বা ক্রিয়তে বুধৈঃ।
বয়ং সর্ব্বে ন জানীমো বিধানং কীদৃশং ক্রতোঃ ॥ ৬
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা চিন্তাযুক্তেন মহীপতিঃ।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি বিললাপ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭
কর্ত্তব্যো মতমালোচ্য সচিবানাংসুহৃজ্জনৈঃ।
প্রেষয়ামাস সদ্যঃ স দূতান্ শ্বশুরমাপ্নিধৌ ॥ ৮

কায়স্থকুলদীপিকা—স০ সি০ ৩২৪-২৫

(৬) That monarch, witnessing the triumph of vice among his subjects, resolved to perform a sacrifice for the purpose of checking the progress of wickedness and averting its evil consequences. He accordingly made up his mind to engage the Saptasati Brahmins as priests in the celebration of the sacrifice. But Gunaram Bhatta, an officer of this court, addressing Adisura, said: Monarch! If those who hold the plough, kill fish and chew parched rice be Brahmins who are then Sudras. Considering the truth of the above remark, the pious king had ample cause to be distracted. In this dilemma he asked the Bhatto, where could good Brahmins be had? In Kanouj, replied the letter. * * * Adisura gladly agreed to apply. * * * Vira sinha was then the reigning prince of Kanauj. He readily acceded to the request of the king of Bengal and sent him five Brahmans, nemed Bhatta haragon se,

Tagore family pp. 3-4

যে, চান্দ্রায়ণ ব্রতের জন্য ইহাঁদিগকে বিশেষভাবে আনা হইয়াছিল। প্রেমবিলাস গ্রন্থেও স্পষ্ট উল্লিখিত দেখি যে, আদিশূর স্বরাজ্যের বৈদিক কুলীন কৌশিকাদিগোত্রীয় পঞ্চব্রাহ্মণের দ্বারা পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করাইয়া কোনও ফল না পাওয়াতেই অবশেষে তিনি বীরসিংহের নিকট পঞ্চব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠাইলেন, এবং ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়া প্রথমে চন্দ্রমুখীকে চান্দ্রায়ণ ব্রতের দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লইয়া পরে পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সম্পাদন করেন (৭)। এই পুত্রেষ্টি যে ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ নহে, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণের দ্বারাই হওয়া সম্ভব, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি।

৯৫। পুত্রেষ্টিযজ্ঞের জন্য ?

পুত্রেষ্টিযজ্ঞের জন্য যে পঞ্চব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিলেন, এসম্বন্ধে জনশ্রুতিও প্রবল, এবং অনেক কুলগ্রন্থে তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। কুলতত্ত্বার্ণবে আছে যে, পুরাকালে, সম্ভবত আদিশূরের পূর্ব্বপুরুষ শালবান বঙ্গাধিপতি হইবার পূর্ব্বে রাজা শূদ্রক কর্ত্তৃক যে সকল সারস্বত ব্রাহ্মণ বঙ্গে সংস্থাপিত হইয়াছিলেন, আদিশূর তাঁহাদিগকে পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করিবার অভিপ্রায় জানাইলে তাঁহারা সে বিষয়ে নিজেদের অক্ষমতা জানাইলেন; আদিশূর অগত্যা বীরসিংহের নিকট পঞ্চব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠাইলেন (৮)। প্রেমবিলাস গ্রন্থে এই কথাই সমর্থিত দেখি (৯)। মুলোপঞ্চাননও বলেন যে পঞ্চব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পুত্রেষ্টিযজ্ঞের ফলেই আদিশূরের পুত্রকন্যা জন্মে (১০)। অন্য কোন কুলগ্রন্থে কন্যা হইবার কথা উল্লিখিত দেখি নাই। ধ্রুবানন্দ মিশ্র এবং হরিমিশ্রও এড়ু মিশ্রের কারিকা অনুসরণ করিয়া পুত্রেষ্টির জন্য পঞ্চব্রাহ্মণের বঙ্গে আগমন সমর্থন করেন (১১)। রামজয়কৃত বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় আছে—"ভূসূর নামক পুত্র আদি নৃপতির মুনিপঞ্চকের যজ্ঞে জন্ম যাঁর স্থির॥" (১২) কুলার্ণব ও কুলপঞ্জিকায় আছে—পুত্রেষ্টিযজ্ঞের জন্য পুত্রদারসমন্বিত পঞ্চব্রাহ্মণ আদিশূর কর্ত্তৃক যথাবিধি পূজিত হইয়াছিলেন (১৩)। আবার কুলরমাতে উক্ত হইয়াছে যে, আদিশূর কর্ত্তৃক শ্রীহর্ষপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণের সহিত ভট্টনারায়ণ আদিশূর কর্ত্তৃক যজ্ঞার্থে আনীত হন (১৪)। এই সমস্ত মিলাইয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পুত্রেষ্টিযজ্ঞের জন্যই ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আদিশূর কর্ত্তৃক ৯৯৯ সম্বতে বঙ্গদেশে সমানীত হইয়াছিলেন।

সুদিন-দুর্দ্দিন।

(শ্রীহুমায়ুন কবির)

যখন প্রভাত রবি হাসে নীলাকাশে,
যখন শরৎশশী স্বচ্ছ তৃপ্ত হাসে
ভরি দেয় ধরা, জীবনে যখন মম
সুখবন্যা শ্রাবণের বারিবন্যা সম
কূলে কূলে ডেকে যায়; যখন জীবন
আলোক-পুলকময় হিরণ-স্বপন,
শুধু হাসি, শুধু গান, শুধু আলাপন—
তোমারে তখন নাথ করিনি স্মরণ।

তার পরে যবে আসে অন্ধরাত্রিপ্রায়
জীবনে বিষাদতম; ঢেকে আসে হায়
সৌভাগ্যগৌরব-রবি—দীর্ণ পুষ্পমত
ঝরে যায় জীবনের সুখ শত শত,
তখন তোমারে প্রভু, হে বিভু আমার!
সমস্ত জীবন দিয়া ডাকি বারবার।

---

(৭) প্রে০ বি০ ২৪ম বিলাস ২৬২ পৃ ২য় ওম্ব—
পঞ্চ ঋষি রাজা আর রাণীরে আনিল।
যজ্ঞের আগে চান্দ্রায়ণ ব্রত করাইল॥
রাজা রাজমহিষী করি ব্রত চান্দ্রায়ণ।
নিষ্পাপ হইয়া কৈল যজ্ঞ আরম্ভণ॥

(৮) কু০ ত০ ১০ ও ১৭ শ্লোক—পূর্ব্বে পাদটীকায় উদ্ধৃত

(৯) প্রে০ বি০ ২৬১ পৃঃ

(১০) পাঁচ গোত্রে পাঁচ ঋষি দারাপত্যে আসি বসি
আদিশূরে করে আশীর্ব্বাদ।
সেই আশীর্ব্বাদের ফলে পুত্রকন্যা জন্মে কালে
দেবাসুরের ভাঙ্গে বিবাদ॥ ১
মুলোপঞ্চানন বচন—স০ নি০ ৩২৫-৩২৭

(১১) রাজা বলে পুত্রেষ্টির কর অনুষ্ঠান।
* * *
পুত্রেষ্টির কথা শুনে সবে মৌনী রয়॥
*
কানাকুব্জ মহাঋষি আসে বঙ্গে পঞ্চ।
ধ্রুবানন্দ—স০ নি০ ৩২৯-৩৩০পৃঃ

(১২) স০ নি০ ৩৩১

(১৩) পুত্রেষ্টি-করণার্থায় পুত্রদারৈঃ সমন্বিতাঃ।
আদিশূরেণ তে সর্ব্বে পূজিতাশ্চ যথাবিধি॥ ৩
স০ নি০ ৫০৭

উপদেশ ও উপদেশক।

(শ্রীরমানাথ পালিত)

ধর্ম্মমণ্ডলীতে কি প্রকার উপদেশ দেওয়া উচিত? ধর্ম্মমণ্ডলীতে আমাদের উপদেশকগণের কি ভাবে উপদেশ দেওয়া উচিত, ইহাই হইল প্রশ্ন। বনমালা যেমন প্রস্ফুটিত কুসুমের মাধুরী আহরণ করিয়া পথিকের হৃদয়ে আনন্দ ঢালিয়া দেয়, উপদেশকগণ ভক্তির গাম্ভীর্য্য ও নম্রতার ভূষণে ভূষিত হইয়া যখন ধর্ম্মমণ্ডলীতে প্রীতির মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত করিয়া দেন তখন প্রকৃতই ধর্ম্মমণ্ডলী আশ্চর্য্য মাধুরীবিমণ্ডিত হয়। উপদেশক ঈশ্বরের দূতস্বরূপ হইয়া তাঁহার বাণী নিকটে আনয়ন করেন। ভগবানের অমৃতময়ী বাণী মণ্ডলীর সভ্যগণের নিকট তিনি প্রচার করেন। পরমাত্মার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা মানবের সংসারক্লিষ্ট প্রাণে আধ্যাত্মিকতার সঞ্জীবনী-সুধা ঢালিয়া দেন। প্রবৃত্তিচালিত মানবহৃদয় যেন ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়, ইহাই তাঁহাদের লক্ষ্য হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। খৃষ্ট যখন কোন জনসঙ্ঘের সম্মুখে উপদেশ দিতেন, তখন তিনি ভগবৎপ্রেমের কথা বলিতেন; হৃদয়ে ভগবানের প্রতি প্রেম, বিশ্বাস ও ভক্তির উদ্রেক করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতেন। মণ্ডলীতে উপদেশকগণেরও কি এই ভাবে উপদেশ দেওয়া উচিত নহে? উপদেশকের কার্য্য যে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। অভিমানশূন্য ত্যাগী পুরুষেরাই প্রকৃতপক্ষে উপদেশকের কার্য্য করিবার যোগ্য। ভোগী অর্ব্বাচীন অভিমানী যাঁহারা, তাঁহারা উপদেশকের কার্য্য করিবার অনুপযুক্ত। ঈদৃশ উপদেষ্টা দ্বারা ধর্ম্মসমাজ ও মণ্ডলীর প্রভূত অমঙ্গলই সাধিত হয়।

আমাদের দেশের লোক কিছু অধিক পরিমাণে ভাব-প্রবণ; তাই ভোগী ও বিলাসী লোকের দ্বারা কোন দিনই আমাদের দেশে ধর্ম্মপ্রচার হয় নাই। উপদেশকের কার্য্য করিতে হইলে, ত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে হইবে। উপদেশের বিষয়গুলি দেশীয় ও জাতীয় ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইবে। এই সংসার-মরুভূর মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে উপদেশক জীবনে যাহা কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন মণ্ডলীর নিকট সেইগুলি পরিস্ফুট করিতে হইবে।

আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্ম্মোপদেশ দিবার পূর্ব্বে ধর্ম্মোপদেষ্টা ত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া ভগবদ্‌জ্ঞান লাভের জন্য সর্ব্বাগ্রে নিজে প্রস্তুত হন। ভগবদ্‌জ্ঞানের মন্দাকিনী ধারা উপদেষ্টার হৃদয়ে প্রবাহিত না হইলে তিনি কি উপদেশ দিবেন জানি না। খৃষ্টের শিষ্যগণ যতদিন না ভগবদ্‌জ্ঞানের অমৃতপ্রসাদ পাইয়াছিলেন, ততদিন তাঁহারা কখনও ধর্ম্মোপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হন নাই। ভোগের ভিতর দিয়া কখনও ভগবদ্-জ্ঞানলাভ হয় না। তাই খৃষ্টের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রচারক এক ধনী লোককে বলিয়াছিলেন যে, যদি তুমি ভগবদ্‌জ্ঞান লাভ করিতে অভিলাষী হও, তাহা হইলে তোমার ভোগের সামগ্রীগুলি বিসর্জ্জন দিয়া আমার অনুগামী হও। বর্ত্তমানে এদেশের অধিকাংশ ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রচারকগণ সাধারণত ভোগের মধ্যেই লালিতপালিত হন বলিয়া ভগবদ্-জ্ঞান ত দূরের কথা, কোন জ্ঞানই লাভ করিতে পারেন না। তাই তাঁহাদের উপদেশ সংসারক্লিষ্ট অবসাদখিন্ন প্রাণে আধ্যাত্মিকতার অমৃতরস ঢালিয়া দিতে সমর্থ হয় না।

আমাদের অন্তরে সেই বিরাটপুরুষ জগৎস্রষ্টাকে হৃদয়ঙ্গম করিবার আকাঙ্ক্ষা স্বতই জাগিয়া উঠে। তাঁহাকে জানিবার এই আকাঙ্ক্ষা কিরূপে পরিতৃপ্ত হইতে পারে, তজ্জন্য আমাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। কাহারও বা হৃদয় কি যেন এক অব্যক্ত অশান্তির তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠে; তাঁহার মনে হয়, সে যেন কোন্ ঘনতমসাচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠে চিরনিবদ্ধ রহিয়াছে।

যাঁহারা উপাসনালয়ে ভজনা করিতে আসেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই হয় ত আদর্শ জীবনযাপন করিতে অভিলাষী হইয়া আসেন। ভগবানের অনন্ত প্রেমের অমৃতময়ী বাণী হৃদয়ঙ্গম করিতে উৎসুক হইয়া আসেন। অনেকের হৃদয় হয় ত ভীতি ও সন্দেহে দোলায়মান, তাই তাঁহাদের বিষাদখিন্ন মুখ দেখিয়া মনে হয়, যেন তাঁহারা একটি গুরুভার সর্ব্বদা হৃদয়ে বহন করিতেছেন। অনেকে হয় ত শোকে ও দুঃখে মগ্ন; যে উপদেশে তাঁহাদের মৃতকল্প প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনার বারি সিঞ্চিত হইতে পারে, এমন উপদেশ শুনিবার জন্যই তাঁহারা ভজনালয়ে আসেন।

যে সকল প্রচারক ভগবদ্-জ্ঞানের সুধা আকণ্ঠ পান করিয়াছেন, তাঁহাদের উপদেশেই ঈদৃশ মানবের হৃদয় ভগবৎপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়া—তাঁহাকে হৃদয়ের অধীশ্বর জানিয়া চিত্তপ্রসাদ লাভ করে।

মণ্ডলীর প্রচারকগণ ভগবদ্-জ্ঞানে ও প্রেমে অধ্যুষিত না থাকিলে ঐসকল পিপাসিত প্রাণের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা কি করিয়া নিবারণ করিবেন জানি না। দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ ধর্ম্মমণ্ডলীর বৃত্তিভোগী প্রচারকগণ সংসারের মোহিনী মায়ায় এমনি আবদ্ধ যে, তাঁহারা ভজনালয়ে আসিয়া উপদেশ দিবার ব্যপদেশে অযথা কতকগুলি অসংলগ্ন বাঁধি কথার অবতারণা করিয়া আবার সংসার-রঙ্গভূমে অভিনয় করিতে চলিয়া যান। ঈদৃশ প্রচারকের কার্য্য বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহারা মণ্ডলীর

আধ্যাত্মিক সৌষ্ঠব-হন্তারক। প্রচারক ধর্ম্ম-তত্ত্ব বুঝাইতে ভজনালয়ে আসেন; কিন্তু তাঁহার উপদেশ শুনিয়া যদি আমার পাপদগ্ধ হৃদয় শান্তি না পায়, তাহা হইলে তাদৃশ প্রচারক উপকারক না হইয়া অপকারকই হইয়া থাকেন। তিনি যদি ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে মণ্ডলীস্থ লোকের প্রাণ উদ্বুদ্ধ করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহার উপদেশ ব্যর্থ হইল বলিতে হইবে।

প্রচারকের উপদেশের নিষ্ফলতার কারণ কি? কারণ এই যে, ভোগের তাড়নায় বিক্ষুব্ধ বলিয়া প্রচারক উপদেশ দিবার সময় কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য রাখিতে পারেন না। যে বিষয়ে দুইটী কথা বলিতে তাঁহার মনে খেয়ালের তরঙ্গ উঠে, যুক্তি বা অযুক্তি বিচার না করিয়া তিনি তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হন। কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া তিনি ভজনালয়ে আসিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। যেন উপদেশমন্দিরটি তাঁহার বক্তৃতা অভ্যাসের স্থান; সেখানে তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিবেন। উপদেশ যাহাতে সুফল উৎপন্ন করে, তদ্বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যক; এবং ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে মণ্ডলীর সভ্যগণের চরিত্র, অবস্থা ও অভাব সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষরূপে জ্ঞান থাকা দরকার। মণ্ডলীর কি কি প্রয়োজন বা কি কি প্রয়োজন নয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপদেশ দিতে হইবে।

উপদেশের প্রণালী সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। বাইবেলে উক্ত হইয়াছে যে, খৃষ্ট একসময় শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "যখন লোকে তোমাদের নিকট শিক্ষার জন্য আসিবে, তখন তোমরা কিরূপে কি বলিবে তদ্বিষয়ে চিন্তিত হইও না—কেন না, তোমরা উপদেষ্টা নও; কিন্তু যিনি তোমাদের অন্তরে সর্ব্বদা বিরাজমান সেই ভগবানই উপদেষ্টা"। উপদেশ দিবার পূর্ব্বে মণ্ডলীর প্রচারকের কর্ত্তব্য, যেন তিনি ধ্যানরত চিত্তে প্রেরণার জন্য ভগবৎসকাশে আত্মনিবেদন করেন। দুঃখের বিষয়, অনেক প্রচারকই তাঁহাদের চিত্তবৃত্তিগুলিকে সংহত করিতে সমর্থ নন—আত্মনিবেদন করিবেন কি প্রকারে? ধ্যান ব্যতীত ভগবানের সহিত যোগসম্পাদন অসম্ভব। এই যোগই ভগবদ্‌জ্ঞানের স্বরূপতত্ত্ব বুঝাইয়া দেয়। যেদিন প্রচারকগণ ভগবদ্‌জ্ঞানের সম্যক্ পরিচয় পাইয়া নিরভিমানী, ত্যাগী ও সন্ন্যাসী হইয়া ধর্ম্মমণ্ডলীতে স্ব স্ব উপদেশে ধর্ম্মজীবনের পরীক্ষিত সত্যের ভাবগঙ্গা প্রবাহিত করিয়া মণ্ডলীর সভ্যগণের প্রবৃত্তিচালিত বিলাসবিভ্রান্তপ্রাণে শান্তিজল ঢালিয়া দিতে পারিবেন, সেই দিন আমরা ধন্য হইব, মণ্ডলী ধন্য হইবে।

বাসগৃহ।

(শ্রীরাধারমণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

প্রাণী মাত্রেরই বাসগৃহ আছে। উহা নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা এবং ক্ষমতা ভগবৎপ্রদত্ত; প্রত্যেক জীব-জন্তুই তাহাদের প্রয়োজনমত বাসগৃহ প্রস্তুত করিয়া থাকে।

মনুষ্যেরও বাসগৃহ আছে;—ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের বাসগৃহ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। দেশের আবহাওয়া, ঘর করিবার উপকরণ ও আবশ্যকীয় বস্তু অনুসারে উহা পৃথক পৃথক রূপে নির্ম্মিত হইয়া থাকে; গ্রীণলণ্ড দেশে প্রচণ্ড শীত, অন্যবিধ উপকরণের অভাবে তথাকার লোকেরা বরফের দেওয়াল ও খিলান করিয়া ঘর করে; দার্জ্জিলিং সহরে কাঠ-পাথর দ্বারাই বেশীর ভাগ ঘর তৈয়ারী হইয়া থাকে; কিন্তু প্রত্যেক দেশেই গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে অভিজ্ঞ (specialist) লোক পাওয়া যায় এবং তাহারা যে গৃহাদি নির্ম্মাণ করে তাহাতে একটু বিশেষত্বও থাকে।

আমরা আজ দুইশত বৎসর পূর্ব্বেকার বঙ্গদেশের পল্লীর গৃহনির্ম্মাণ পদ্ধতির কথা বলিতেছি; প্রায় প্রতি পল্লীতেই বেশীর ভাগ মাটীর দেওয়াল এবং খড়ের ছাউনি চাল বাঁধিয়া ঘর করা হইত; যে যে স্থানে মাটীর দেওয়াল থাকিত না, সেখানে বাঁশ বা কাঠের বেড়া দেওয়া হইত। গ্রামের মধ্যে যাঁহার অবস্থা বিশেষ ভাল, তিনিই কেবল ইটের গাঁথনী কোঠা ঘর করিতেন। সকলেই ঘর করিবার সময় বিবেচনা করিত কোন্ 'দোয়ারী' ঘর করিব? তখনকার লোকে—বিশেষতঃ পল্লীবাসীরা দক্ষিণদ্বারী ঘর করিতেন; এবং যাঁহার অবস্থা ভাল তিনি প্রথমে আবশ্যকমত ঘর দক্ষিণদ্বারী করিয়া বাকীগুলি পূর্ব্বদ্বারী বা পশ্চিমদ্বারী করিতেন—পারতপক্ষে কেহই উত্তরদ্বারী করিতেন না। একটী প্রবাদ আছে—

দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা
পূর্ব্বদ্বারী তাহার প্রজা!
পশ্চিমদ্বারীর সদাই তাপ
উত্তরদ্বারীর খাজানা মাপ।

খুব গরীব লোক, যাঁহাদের খাজানা দিবার ক্ষমতা ছিল না, তাঁহারাই বোধ হয় উত্তরদ্বারী ঘর করিতেন।

বৎসরের মধ্যে দুইটী অয়ন হয়, উত্তরায়ন এবং দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ন ১লা মাঘ হইতে আরম্ভ হয় এবং ১লা শ্রাবণ হইতে দক্ষিণায়ন। উত্তরায়নের মধ্যাংশে অল্পদিনের জন্য বক্রভাবে রৌদ্র 'উত্তর দোয়ারী' ঘরের মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু বৎসরের বেশীর ভাগ সময়ই পাওয়া যায় না; আর শীতকালে উত্তরদোয়ারী-ঘরে অতিশয় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগে ও সূর্য্যালোকের অভাবে ঘর অস্বাস্থ্যকর হয়। সেজন্য জানা যাইতেছে যে,

যাহারা একেবারেই অসমর্থ তাহারাই কেবল উত্তর-দোয়ারী ঘরে থাকে; এই প্রথা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। দিগনির্ণয় যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব্বে ভট্টাচার্য্য দ্বারা সূর্য্য দেখিয়া ঘরের দোয়ারের দিগনির্ণয় হইত। ইহাতে বাড়ীর ভদ্রাসনের বা জমীর আয়তনের সহিত রাস্তাঘাটের সামঞ্জস্য রক্ষা হইত না।

যাঁহারা চকবন্দী বাড়ী করিতেন, তাঁহারা আবার দক্ষিণদ্বারী সদর দরজা রাখিতেন না। কারণ তৎকালে প্রবাদ বা জনশ্রুতি ছিল যে, যমরাজার বাড়ী দক্ষিণ দিকে এবং তাঁহার দরজাও নাকি দক্ষিণদোয়ারী। সম্ভবতঃ দক্ষিণ দিকে দরজা রাখিলে পাছে অনবরত দক্ষিণ দিকে নজর প'ড়ে ও যমের পেয়াদা শীঘ্র বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারে, সেজন্য দক্ষিণদ্বারী সদর দরজা করা হইত না।

কেহ যখন নূতন বাড়ী করিবার কল্পনা করিতেন, তখন তিনি এই প্রবাদ বচনের উপর নির্ভর করিয়া করিতেন,

উত্তরে মেলা, দক্ষিণে খোলা— *

পূর্ব্বে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ।

ইহার অর্থ বাড়ীর উত্তরে মেলা অর্থাৎ অনেক রকম গাছের চারা লাগান হইত অর্থাৎ বাগ-বাগিচা করা হইত। দক্ষিণ দিকে সদর দরজা না রাখিলেও, দক্ষিণ দিকে খোলা জায়গা রাখা হইত, কোনও গাছপালা লাগাইয়া অন্ধকার করা হইত না। পূর্ব্বে হাঁস অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে পুকুর রাখা হইত, তাহাতে হাঁস চরিত; এবং পশ্চিম দিকে বাঁশঝাড় লাগান হইত, যাহাতে পশ্চিমের ঝড় হইতে গৃহ রক্ষা পায়।

এসব তো গেল ঘরতৈয়ারীর বহিরঙ্গ-বিচার—এখন অন্তরঙ্গ কথা কিছু বলা যাক। প্রায়ই লোকে ঘরের মেঝের অনেক উচ্চে ছোট ছোট 'ঘুলঘুলি' অর্থাৎ খুব ছোট ছোট্‌ জানালা রাখিত এবং একটী মাত্র তিন চারি হাত লম্বা দরজা থাকিত; বেশী জানালা দরজা রাখিত না, পাছে চোর বা ডাকাত বাহির হইতে দেখিতে পায়। বাক্স থাকিলেও লোকে মেঝেতে, বা দেওয়ালে টাকাকড়ি পুতিয়া রাখিত, আগুন লাগিলে পুড়িয়া না যায় বা ডাকাত পড়িলে বাক্স ভাঙ্গিয়া কিছু না পায়। গৃহকর্ত্তা ঘরের বারান্দায় শুইয়া থাকিতেন। কি শীত কি গ্রীষ্ম তাঁহার বারান্দায় থাকিবার নিয়ম; কারণ ঘরের মধ্যে থাকিলে বিষম বিপদ, যদি ডাকাতে শিকল বন্ধ করিয়া আগুন ধরাইয়া দেয়, তবে যে প্রাণ যাইবে! সুতরাং এক কথায় গৃহ করিয়াও বিশেষ সুখ ছিল না—ইহা যেন কতকটা বাবুই পাখীর অবস্থা, যেমন—

"ঘর থাকিতে বাবুই ভেজে"

* পাঠান্তর—উত্তরে বেড়ে দক্ষিণে ছেড়ে অর্থাৎ উত্তরদিকে প্রাচীরের দ্বারা ঘেরা হইত।

ক্রমেই মানুষ সভ্য হইয়াছে। কালক্রমে অভিজ্ঞেরা (specialist) ঠিক করিলেন যে, যদি পাশের দিকে ছোট একটী দরজা রাখা যায় এবং তাহার বাহির দিকে শিকল না থাকে, তবে ঘরের ভিতর থাকা যায়; কারণ বড় দরজাটিতে শিকল লাগাইলেও পাশের দরজা বন্ধ করিবার ভয় থাকে না। ক্রমে উন্নতি হইল "মাঠ গুদাম" করা হইল, আগুনে পুড়িবার ভয় গেল; ক্রমে ক্রমে কাঠের খুঁটি বেতের বাঁধন রংদার হইতে লাগিল।

অভয়।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্)

ভৈরবী—একতালা।

তুমি আমাদের থাক্‌তে সহায়
করব না ভয়—করব না ভয়।
ঝড়ের রাত্তি সে-ও পোহায়
করব না ভয়—করব না ভয়।
ঘনাক না ঘোর আঁধার রাতি
থাক্‌তে মোদের সাথের সাথী
কে নেভাবে প্রাণের বাতি
অমর ভাতি জ্যোতির্ম্ময়।
ব্যথার প্রদীপ সে-ও আলো দেয়
করব না ভয়—করব না ভয়॥
ভবার্ণবের ভেলা তুমি
করব না ভয়—করব না ভয়
অন্ধকারের ধ্রুবতারা
করব না ভয়—করব না ভয়।
অভয় মনে হাস্য মুখে
চলব সকল দুঃখে সুখে
তোমার নামটি লয়ে বুকে
গেয়ে যাব প্রেমেরই জয়
পড়ব শেষে পায়ে এসে
করব না ভয়—করব না ভয়॥

রাজর্ষি এব্রাহিম বল্‌খী সম্বন্ধে কয়েকটী গল্প।

(মৌলবী জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ কাব্যনিধি)

(১)

আফগানস্থানের অন্তর্গত 'বলখ নামে' সুপ্রসিদ্ধ নগর আছে। প্রায় বারশত বৎসর পূর্ব্বে তথায় এব্রাহিম নামে নরপতি ছিলেন। তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া

জনপূজ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার বৈরাগ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে—আমরা তন্মধ্যে কয়েকটী প্রকাশিত করিলাম।

একদা রাজা কতকগুলি পাত্রমিত্র ও সৈন্য সমভিব্যাহারে মৃগয়া উদ্দেশ্যে কোন গভীর বনে প্রবেশ করিলেন। পাত্রমিত্র ও সেনাসামন্তগণ দিকে দিকে মৃগয়ালিপ্ত হইল। রাজা অনেক দূরে একটি হরিণ দেখিয়া, সবেগে তাহার দিকে অশ্বচালনা করিলেন। সুচতুর হরিণ, ঘোটকের পদধ্বনি শুনিয়া চকিত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। রাজার অশ্বও হরিণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল, কিন্তু কোনগতিকে হরিণের সমীপস্থ হইতে পারিল না।

অনন্তর বনে বনে প্রায় দুই ক্রোশ পথ অতিবেগে দৌড়াইয়া হরিণ কিছু ক্লান্ত হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইল এবং অশ্বারোহী রাজার প্রতি চাহিয়া বলিল, "মহারাজ! ঈশ্বর কি জীবসংহার নিমিত্তই তোমায় সৃজন করিয়াছেন? তুমি জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্য হইয়া আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের বধোপায় অবলম্বন করিতেছ? ধিক্ তোমার মনুষ্যত্বে! যাহার মনে মায়া-মমতা, দয়া-ধর্ম্মের কিছুমাত্র লেশ নাই, সে আবার মনুষ্য!" এই বলিয়া হরিণ অন্যত্র চলিয়া গেল। রাজা কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, কিন্তু তাহার কথাগুলি রাজার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইল। তিনি তদ্দণ্ডেই সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ ও সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া কাননে কাননে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

(২)

রাজা এব্রাহিম মৃগয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া, বিশ্রামলাভার্থে শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নিতান্ত কুরূপা মলিনবসনা ও বিকটদশনা এক দাসী শয্যায় শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে। সামান্য দাসীর রাজ-শয্যায় শয়ন! দেখিয়া রাজা ক্রোধরক্ত লোচনে, কঠোর কশা হস্তে লইয়া ক্রমান্বয়ে চল্লিশবার সবলে প্রহার করিলেন। দাসী কশাঘাতে সচেতনা হইয়া হাসিতে হাসিতে ধীরে ধীরে অন্যত্র যাইতে লাগিল। কোপজনিত তীব্র আঘাতে দাসী বিন্দুমাত্র অশ্রুপাত করিল না, আহত স্থানে একবারও হাত দিল না, কিছুমাত্র তাহার ভয়লক্ষণও দেখা গেল না; বরং উহার বিপরীতে হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিতেছে দেখিয়া তখনই রাজা বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— "দাসি! আমি তোরে এত বলে কশাঘাত করিয়াছি যে, আহত স্থান স্ফীত হইয়াছে ও কোন কোন স্থান কাটিয়া বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িতেছে। এ অবস্থায় কাতর না হইয়া, তোর হাসিবার কারণ কি, ত্বরায় বল?" দাসী করযোড়ে বলিল—"রাজন! আমি আপনার বিছানায় অল্প সময় ঘুমাইয়া চল্লিশ কশাঘাত দণ্ডভোগ করিলাম, আর যিনি দিনরাত্রি এই বিছানায় ভোজন, শয়ন উপবেশন ইত্যাদি নানাপ্রকার সুখ ভোগ করেন, তাঁহার প্রভু তাঁহাকে কতই না কশাঘাত করিবেন, এই মনে হওয়ায় আমার ব্যথাকে ব্যথা বোধ হয় নাই।" দাসী এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইলে, রাজা তন্মুহূর্ত্তেই রাজ্যের সহিত রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তপস্বিবেশ ধারণপূর্ব্বক বনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

(৩)

রাজা এব্রাহিম একদা আড়ম্বরের সহিত মৎস্যবিনাশে নদীতীরে গমন করি াছিলেন। তাঁহার সঙ্গীরা নানা উপায়ে মৎস্য ধরিতেছিল। তিনি নদীতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা দেখিতে পাইলেন, বয়োবৃদ্ধ তেজঃপুঞ্জ এক মহর্ষি উপাসনা হেতু নদীজলে হস্তপদ প্রক্ষালন করিতেছেন। মহর্ষির বদনমণ্ডল অরুণকিরণের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়; শুভ্র শ্মশ্রু নাভিস্থল পর্য্যন্ত লম্বিত। তাঁহার ভাবভঙ্গী ও শরীরকান্তি দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণ ভক্তিরসে উচ্ছলিত ও আপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি নাতিবিলম্বে মহর্ষির পদতলে পতিত হইলেন। এতদ্দর্শনে মহর্ষি সসম্ভ্রমে তাঁহাকে উঠাইয়া বাৎসল্য ভাবে আলিঙ্গন ও সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "বৎস! আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইও না; আমার নাম খেজর। ঈশ্বর তোমার শিক্ষাবিধান নিমিত্ত আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। দেখ বৎস! সংসার অনিত্য; ইহার স্থায়িত্ব নাই; কেন না, যে কোন সময়ে ইহা পরিত্যাগ করিয়া অন্তকপুরের অতিথি হইতে হইবে। ইহার অস্থায়ী মমতা ও কুহকজালে বন্দী হইয়া অনন্তজীবন ক্ষয় করা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নহে। আমার উপদেশ শুন; রাজ্য পরিত্যাগ কর, সংসারধর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ কর এবং যে সংসারের অস্তিত্ব কখনও ক্ষয় হইবার নহে, তাহার দিকে মনোনিবেশ কর। দেখ বৎস! ঈশ্বর স্বীয় জ্যোতিকণা দ্বারা মানুষের আত্মা গঠিত করিয়াছেন। প্রথমে উহা ঈশ্বরের আদেশক্রমে গুপ্তভাবে অবস্থিত ছিল; তৎপরে তিনি আপন কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য দেখাইবার নিমিত্ত উহাকে মনুষ্যের দেহাগারে সযত্নে প্রোথিত করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছেন। বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে জীবাত্মা দেহরাজ্যের সম্রাট, অপরাপর অবয়ব তদীয় আদেশে পরিচালিত। অতএব সাংসারিক বিষয়বাসনা, সুখসম্ভোগ, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি হইতে বিরত হইয়া জীবাত্মাকে চেনা, সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিযোগসহকারে মনোনিবেশ করা, কি রাজা, কি ধনবান সকলেরই ভয় হইতে নির্ভয়ে থাকা এবং পিতা-মাতা,

কি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, কি আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধব সকলেরই স্নেহ-মমতায় বিসর্জ্জন দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। আমি কি খাইয়া জীবন ধারণ করিব, দারাকলত্র আত্মীয় প্রভৃতি কি উপায়ে প্রতিপালিত হইবে, সেজন্য নিরন্তর চিন্তাকুল থাকা বিধেয় নয়। কুটীর মধ্যে একাকী বাস করিয়া ধীর মনে অবিচলিত ও অপ্রতিহত ভক্তিভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। রাজ্য বা রাজগৌরবের প্রতি মনসংযোগ করিয়া অহঙ্কৃত ও ধৃষ্ট হওয়া ভাল নয়। যাহারা কেবল ধনোপার্জ্জনে ব্যতিব্যস্ত থাকে এবং ভুলিয়াও ঈশ্বরের নাম মুখে আনে না, তাহারা এক প্রকার নররূপী পশু। কেন না, ন্যায়ান্যায় বিবেচনাশূন্য পশুরাই উদর পূর্ণ করিবার জন্য যাহার-তাহার শস্য নষ্ট করিয়া থাকে। আরও শুন, আমি তোমাকে যে বিষয়ের উপদেশ দিতেছি, তাহাতে নিবিষ্ট হইবার প্রধান উপায় ও সহায় কেবলমাত্র সাহস। সাহসকে সহায় এবং উহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিলে কেবল এ বিষয় কেন, কোন কর্ম্মই সম্পাদিত হয় না। সাহসহীন লোকের অনেকবিধ কৌশল শিক্ষা থাকিলেও সে সকল কার্য্যকালে কোনও কার্য্যে পরিণত হয় না, এবং সে জনসমাজে নিতান্ত ঘৃণ্য বলিয়া মনে হয়। আর যাঁহারা সাহস সহকারে আমাদের অধিকৃত ধনরাশি দীনহীন অনাথগণকে দান করিয়া নিয়ত ঈশ্বরচর্চ্চায় রত থাকেন, তাঁহারা পৃথিবী হইতে নিষ্পাপ ও নির্ভয় হইয়া যান।

কিন্তু সাধারণতঃ এবিষয়ে এখনকার লোকের আস্থা আদৌ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহাদের অন্তঃকরণ কামক্রোধলোভাদি রিপুচয়ের মায়াপাশে সর্ব্বক্ষণ সমাচ্ছন্ন থাকায় তাহাতে ঈশ্বরের গূঢ় রহস্যকুসুম প্রস্ফুটিত হইতে পায় না। মনে নিয়ত অশেষবিধ বিষয়চিন্তার আবির্ভাব হইলে, ঈশ্বরের জ্যোতিঃ তন্মধ্যে ঘৃণাবশতঃ প্রবেশ করে না। কাজেই তাহারা সংসার ভিন্ন ঈশ্বরকে পায় না। আর যাহারা ঈশ্বরপ্রাপ্তি ও সংসারপ্রাপ্তি উভয়ই কামনা করে, তাহাদেরও ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটিয়া উঠে না। কারণ একাধারে দুগ্ধ ও পঙ্ক নিক্ষিপ্ত হইলে দুগ্ধের পবিত্রতাহেতু পঙ্ক পবিত্র হয় না, বরং পঙ্ক সংস্পর্শে দুগ্ধই নষ্ট হয়। সুবাসিত গোলাপজল-পরিপূর্ণ কূপ মধ্যে কুকুরে ঝাঁপ দিলে তৎক্ষণাৎ ঐ জল অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে।

পৃথিবী মায়ারূপিণী, মুহুর্মুহুঃ নানাবিধ ভাব পরিগ্রহ করিয়া আবালবৃদ্ধ সকলকেই আপন বশীভূত করিবার চেষ্টা করে। অজ্ঞ লোকেরা পৃথিবীর কুহক ও ছলনা বুঝিতে না পারিয়া ইহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া স্ব স্ব পরকালের পথ একেবারে কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলে। যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্ববিদ্, তাঁহারা কখনও কুহকিনী পৃথিবীর মায়াপাশে বদ্ধ হন না বরং ইহা পরিত্যাগ করিবার জন্য লোকদিগকে শতবার পরামর্শ দেন। বীরকুলশ্রেষ্ঠ পুরুষপূজনীয় আলি (কঃ ওঃ) * এই সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া জগতের প্রাধান্য লাভ করতঃ অমর হইয়া অমরপুরে গমন করিয়াছেন। আর মায়ারূপী পৃথিবীর বশ্যতাপন্ন এবং সাধ্যাতীত বস্তুর লোভপরবশ হইয়া দামাস্কসের-(দামেস্কের) রাজা পাপাত্মা এজিদ অসঙ্গত কারণে অনাহারে কারবালার মরুভূমিতে নবীবংশ ধ্বংস করিয়া সকল শ্রেণীর লোকেরই একেবারে ঘৃণাস্পদ এবং পরকালে বিশেষ যাতনাময় নরকে পাপভোগের যোগ্য হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। কালে কালে সেই মহাপাপীর দুর্নাম, অপযশঃ ও নিন্দা ঘোষিত হইয়া আসিতেছে। অন্যত্র বিষয়রক্ষা, ধনরক্ষা ও মানরক্ষার্থে লোকে বিবাদপরবশ হইয়া পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধে পরিব্যাপ্ত হয় এবং ঈশ্বরের সৃষ্টির বিনাশসাধন করিয়া যুদ্ধস্থল নরশোণিতে রঞ্জিত করে। পৃথিবীর লোকেরা লোভহেতু না করিতে পারে এমন কুকর্ম্মই নাই। সুতরাং পৃথিবী পাপময়ী ও পাপপঙ্কিলা হইয়া আপন সন্তানগণের মর্ম্মে অলক্ষ্যে কুঠারাঘাত করে।

এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া পৃথিবীর অস্থায়ী মমতায় মোহিত হওয়া ও তদ্গতপ্রাণ হওয়া একান্ত গর্হিত কার্য্য। কালে এই পৃথিবীই যে শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা কেহই পূর্ব্বে স্থির করিতে পারে না। অতএব মৃত্যুর পূর্ব্বেই শব মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত। যেমন মৃত্যু হইলে মনুষ্যের ধন, রত্ন, বিষয়-আশয়, মান-সম্ভ্রম, খ্যাতিপ্রতিপত্তি কিছুই সঙ্গে যায় না, তেমনি জীবিত থাকিতে থাকিতে ঐ সকলকে ত্যাগ করিতে পারিলে যথার্থ তত্ত্ববিদ্ মধ্যে পরিগণিত হইবার একান্ত ভরসা করা যায়। ঈশ্বরের নাম এমন অমৃতময় যে যাঁহারা ভক্তিসহযোগে যথারীতি উহা অভ্যাস করেন, তাঁহাদের মরণকে মরণ বোধ হয় না; তাঁহাদের নিকট জীবন-মরণ একই কথা। ঈশ্বরের নামই তাঁহাদের কর্ম্মফলের মৃতসঞ্জীবনী। মরিলেও লোকে তাঁহাদের নামোচ্চারণ করিয়া এবং মাহাত্ম্য, সাধনপ্রণালী ও ক্রিয়াকলাপাদির পরিচয় দিয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া দেয়। এইজন্য তাঁহারা মৃতদের মধ্যে পরিগণিত নহেন। পুরুষপ্রধান হজরত মহম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন—"যাঁহারা ঈশ্বর-পথের পথিক ও সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে স্মরণ করেন তাঁহারাই অমর; অতএব বৎস! তোমার শিক্ষার নিমিত্ত যাহা উপদেশ দিলাম, মনে স্মরণ রাখিবে।" এই বলিয়া তাপস-প্রবর খেজর অন্তর্হিত হইলে রাজা এব্রাহিম তদ্দণ্ডেই

* কঃ ওঃ—'করম উল্লাহে উরাজ হুঃ' অর্থাৎ পরমপাতা পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি (করম) কৃপা করুন।

সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কাননপথে প্রস্থান করিলেন।

(৪)

একদা নিশাকালে মহামতি নরপতি এব্রাহিম কারুকার্য্য-খচিত ত্রিতল প্রাসাদে সানন্দে সুপ্তিসুখ অনুভব করিতেছিলেন;—এমন সময়ে ছাদের উপরে কোন মনুষ্যের দ্রুত পদসঞ্চালন শব্দ শুনিয়া জাগরিত ও চকিত হইয়া দীপালোকে দেখিলেন, এক ব্যক্তি যেন কোন অপহৃত বস্তুর অন্বেষণ করিতেছে। রাজা তৎক্ষণাৎ তাহার ছাদের উপর উঠিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "অদ্য সন্ধ্যার সময় আমার একটী উট কোনদিকে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে, আমি তাহার সন্ধান করিতে এখানে আসিয়াছি।" রাজা তাহার কথায় হাস্য সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া বলিলেন—"নির্ব্বোধ! উট কি ছাদে উঠিতে পারে? না ছাদের উপর তাহার সন্ধান হয়?" এই কথা শুনিবামাত্র সে রাজাকে ব্যঙ্গ করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "ঈশ্বর কি সিংহাসনে আরোহণ করেন? না তথায় তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায়?" তাহার এই উপদেশসম্বলিত ব্যঙ্গ বাক্যের ভাব গ্রহণ করিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ সাংসারিক ব্যবহার পরিহার পূর্ব্বক বনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

আগ্নেয়গিরির আত্মপ্রকাশ।

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

প্রাচীন কোষ-গ্রন্থাদিতে পর্ব্বতের "অচল" নামটী দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত নামটী যে যোগ্য পাত্রেই অর্পিত হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই; কিন্তু ঐ শান্তশিষ্ট অচলদেবটী যখন সময়ে সময়ে চরম চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া বিশ্বকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন তখন আত্মভোলা মহেশ্বর ও বিশ্ববিনাশক ধূর্জ্জটীকে স্মরণ করিয়া আমাদিগকে ঐ অসীম বৈপরীত্যের আশু সমাধান করিয়া লইতে হয়।

শুনা যায় পুরাকালে পক্ষধারী পর্ব্বতগণ অচলরূপ অপবাদটা আপনাদের স্কন্ধ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়াছিলেন; কিন্তু গোত্রভিদ্ দেবরাজের কৃপায় পক্ষহীন হওয়াতে ঘাড়ের বোঝা দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল, তাই সেই অপমানটার প্রতিশোধমনসেই হউক অথবা একঘেঁয়ে জীবনের পরিবর্ত্তনকল্পেই হউক, উহাদিগকে যে সময়ে সময়ে বিশ্বগ্রাসী রুদ্রদেবের প্রচণ্ড লীলাভিনয় করিতে হয় উহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই; কিন্তু ঐ অভিনয়ের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় না থাকাতে, উহা যে সময়ে সময়ে মানবের পক্ষে ভীষণ হইয়া উঠে ইহাই চিন্তার বিষয়।

ভয়াবহ নিস্তব্ধতা ভীষণতম উপপ্লবের পূর্ব্বাভাস। ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝা উৎপন্ন করিবার পূর্ব্বে বিশ্বপ্রকৃতি আশ্চর্য্যরকম স্তব্ধ হইয়া যায়। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব ও খনিজ বিদ্যার অধ্যাপক জন মিলনে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে জাপানের ছদ্মবেশী আগ্নেয়গিরি বান্দেসানকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়া তাহার প্রশান্তগম্ভীর ভাব অবলোকন করিলেন। সজীব আগ্নেয়গিরির কোন লক্ষণই উহাতে পরিস্ফুট ছিল না। দূর যুগেও উহার সামান্যতম উৎপাতেরও কোন নিদর্শন বা জনপ্রবাদ পাওয়া যায় নাই। যুগযুগান্ত ধরিয়া আকাশচুম্বী প্রশান্ত শৃঙ্গধারী গিরিবর নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান।

দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রসমূহ অসীম শান্তির পরিচয় দিতেছে। মৃগশিশুগণ সানন্দে বিচরণ করিয়া রাজ্যটীকে আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছে। একটী উষ্ণপ্রস্রবণ অসংখ্য রোগক্লিষ্ট মানবকে রোগমুক্ত করিয়া পর্ব্বতের অনন্ত মহিমা ঘোষণা করিতেছে। অধ্যাপকবর প্রস্রবণটীকে আগ্নেয়গিরির একটী লক্ষণ বলিয়া মনে করিলেন। ক্রমে ক্রমে আরও দুইটী প্রধান লক্ষণ—পুঞ্জীভূত গিরিস্রাব ও আগ্নেয়গিরি-গুহামুখ আবিষ্কৃত হইয়া ইহাকে প্রকৃত আগ্নেয়গিরি বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিল।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই, হেমময় সৌরকিরণ তৃণগুচ্ছে প্রতিফলিত হইয়া রাজ্যটীকে স্বর্ণময় করিয়া তুলিয়াছে। সানন্দে কৃষকগণ নিজ নিজ কর্ম্ম সমাপন করিতেছে। সহসা সহস্র বজ্রধ্বনির ন্যায় ভীষণ শব্দে বান্দেসানের শিখর বিচ্যুত হইয়া পড়িল। গাঢ় ধূমে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অবিরাম কর্দ্দম ও শিলাখণ্ড বর্ষিত হইয়া পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া ফেলিল।

বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণা মতে ঐ কর্দ্দম ও শিলাখণ্ডসমূহকে নির্দ্দিষ্ট আকারে রূপান্তরিত করিয়া পর পর সাজাইয়া রাখিলে, ঐ খণ্ডসমূহ দ্বারা পৃথিবীকে পাঁচবার পরিবেষ্টিত করিতে পারা যাইত। ঐ দ্রব্যসমূহকে ১৫০০০ টন হিসাবে প্রত্যেক বাষ্পীয় পোতে বোঝাই করিলে ঐ পোতশ্রেণী দ্বারা লণ্ডন হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত জলময় ভূভাগটীকে সমাচ্ছন্ন করিতে পারা যাইত।

উক্ত প্রস্তর ও কর্দ্দমের সংমিশ্রণে উৎপন্ন একটী নদী ঘণ্টায় আটচল্লিশ মাইল বেগে প্রবাহিত হইয়া বহু গ্রামকে শত শত ফুট নিম্নে সমাহিত করিয়া ফেলিল। শস্যশ্যামল ক্ষেত্ররাজি নিমেষে নগ্ন ধূসর প্রান্তরে পরিণত হইল। প্রবল বায়ু চতুর্দ্দিকে ধ্বংসের রাজ্য বিস্তার করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। জনসংঘ বিধ্বস্ত ও শস্যসমূহ মৃত্তিকালিপ্ত হইয়া বিনষ্টপ্রায় হইল। একটী পার্ব্বত্য-

নির্ঝরের জলরাশি হঠাৎ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী শুষ্ক ভূখণ্ডকে একটী নূতন হ্রদে পরিণত করিয়া ফেলিল। শত শত মণ ভারী পর্ব্বতখণ্ডসমূহ ভীষণ বেগে বিক্ষিপ্ত হইয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী আট দশ মাইল বিস্তৃত ভূভাগকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

বান্দেসান পর্ব্বতটী একটী জনবিরল প্রদেশে অবস্থিত ছিল বলিয়া হতাহতের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হইল। উক্ত স্থানের সমূহ গ্রামের অধিবাসী মাত্র ৪০১ জন মনুষ্য এই বিস্ফোরণে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। পত্রসম্ভার-বঞ্চিত বিটপীশ্রেণী শ্রীহীন ভাবে দণ্ডায়মান। তাপদগ্ধ অগণ্য বন্যজন্তুর মৃতদেহে নদীনালা সমাচ্ছন্ন। সর্ব্বত্রই প্রেত-পুরীর বিভীষিকাময় দৃশ্য বিরাজ করিতে লাগিল।

উদ্গীরণ আরম্ভ হইবার তিন দিন পরে অধ্যাপক মিল্‌নে সদলবলে উপস্থিত হইলেন। বাষ্পময় পিচ্ছিল পথসমূহ অতিক্রম করিয়া তিনি পর্ব্বতটীকে নানাদিক হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জানিতে পারিলেন যে উহার বিশাল শৃঙ্গদেশটী বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং পাতাল-স্পর্শী গুহামুখ হইতে অবিরাম ধূম নির্গত হইতেছে।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে আসামা-বিস্ফোরণের পর জাপানরাজ্যে এতাদৃশ ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ আর কখনও সংঘটিত হয় নাই। ভুজগকুণ্ডলীর ন্যায় শুষ্ক গিরিনিঃস্রাব আসামা পর্ব্বতগাত্রে বেষ্টিত থাকিয়া এখনও সেই অতীত ব্যাপারের সাক্ষ্য দিতেছে—অতলস্পর্শী গুহামুখ হইতে বিবাক্ত ধূম এখনও অবিরাম নির্গত হইতেছে। অধ্যাপক মিল্‌নের নেতৃত্বা-ধীনে প্রেরিত অভিযান উক্ত গুহামুখের গভীরতার পরিমাপ করিতে গিয়া অসহ্য উত্তাপে সমুদয় যন্ত্রপাতি বিনষ্ট হওয়াতে বিফলমনোরথ হন।

উপরোক্ত আসামা ও বান্দেসান পর্ব্বতদ্বয়ের বিস্ফোরণ উল্লেখযোগ্য হইলেও উহাদের কোনটিকেই ভীষণতম উদ্গীরণ বলা যায় না। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট তারিখে সংঘটিত ক্রাকাতোয়া-বিস্ফোরণের নিকট উহারা কিছুই নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিস্ফোরণ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ক্রাকাতোয়া সাধারণের নিকট অজ্ঞাত ছিল। কোন বৈজ্ঞানিকই কখনও উহাকে পর্য্যবেক্ষণ-যোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। যাহা হউক এই ক্রাকা-তোয়া-বিস্ফোরণটাই পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতম বিস্ফোরণ বলিয়া গণ্য হয়।

ক্রাকাতোয়া জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সুন্দা প্রণালীর একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। জাভাদ্বীপটী বহু আগ্নেয়গিরি-অধ্যুষিত। উহাদের কোন কোনটী বারহাজার ফুট উচ্চ ও অবিরাম উদ্গীরণরত। এই পর্ব্বতসমূহের নিকটবর্ত্তী তিন হাজার ফুট উচ্চ ক্রাকাতোয়া কখনও উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে উহাতে নানা বিষয় আবিষ্কার করিতে পারিতেন।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, দূর যুগে ক্রাকাতোয়া সুমাত্রা ও জাভাদ্বীপকে আবে-ষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। অনন্তর কোন ভয়া-বহ বিস্ফোরণে উহার সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিধ্বস্ত হইয়া যাওয়াতে উহা নগণ্য হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু উহার বিশাল গহ্বর তখনও শক্তিসঞ্চয়ে রত ছিল। এই সুবিপুল গহ্বরটী কেবল ক্রাকাতোয়া দ্বীপেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সুন্দাপ্রণালীর আরও বহু দ্বীপকে উহা অন্তর্গত করিয়া লইয়াছিল।

বৈজ্ঞানিকদের সকল অগ্রাহ্যকে তুচ্ছ করিয়া ক্রাকা-তোয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে নিছক বাষ্প নির্গমন-রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। দিনের পর দিন ধরিয়া বিশাল গহ্বরের এক-একটী কোষ উন্মুক্ত হইতে লাগিল। ২৪শে জুন তারিখে ভূতলস্থ দুইটী বিশাল গুহামুখ উন্মুক্ত হইয়া সমুদ্রবারিকে প্রবেশের সুবিধা করিয়া দিল। অনন্তর গজ-কচ্ছপের বিস্ময়কর যুদ্ধের ন্যায় তপ্ত বায়ু ও অগ্নিশিখার অদ্ভুত রণোদ্যম চলিতে লাগিল।

২৬শে আগষ্ট বিস্ফোরণ সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ আকার ধারণ করে। মৃত্তিকাতলস্থ বিস্ফোরণসমূহ সমুদ্রবারিকে প্রত্যাহত করিয়া বারিধিবক্ষকে ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল করিয়া ফেলিল। গাঢ় ধূমে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সারা রাত্রি ধরিয়া বিদ্যুল্লহরী উহার উপর নানাপ্রকার ক্রীড়া-ভঙ্গি প্রদর্শন করিতে লাগিল। অবিশ্রান্ত প্রস্তর ও কর্দ্দমবৃষ্টি সুন্দা প্রণালীকে অসম্ভবরূপে পঙ্কিল করিয়া তুলিল, প্রবল জলোচ্ছ্বাসে সুমাত্রা ও জাভা দ্বীপের বহু বন্দর বিধ্বস্ত হইয়া গেল। প্রায় ৩৭ হাজার মানব অকালে প্রাণ হারাইল। এক-একটী তরঙ্গের উচ্চতা ১৩৫ ফুট পর্য্যন্ত হইয়াছিল। একটী রণতরী জলোচ্ছ্বাসে সুন্দা প্রণালী হইতে একক্রোশ দূরবর্ত্তী ৩০ ফুট উচ্চ উপত্যকার উপর উত্তোলিত হইয়াছিল। বজ্রগম্ভীরধ্বনি-সমূহ উদ্ভূত হইয়া আকাশ পরিপ্লাবিত করিয়া ফেলিল। ৪০০০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতেও উক্ত শব্দ শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। কোন কোন স্থলে আসন্ন বিপদা-শঙ্কায় রণতরী ও শান্তিরক্ষকসমূহ প্রস্তুত রাখিতে হইয়াছিল। উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণাসমূহ প্রায় বৎসরাধিক কাল গগনে ভাসমান ছিল।

এই বিস্ফোরণের পর হইতে ক্রাকাতোয়া ১৫০ ফ্যাদম (fathom) গভীর জলে অবস্থান করিতেছে। দুইটী নূতন দ্বীপ মস্তকোত্তলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কোন উদ্গীরণেই এইরূপ বিপর্য্যয় সাধিত হয় নাই।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

ভৈরবী—তেওরা।

অরূপেরি রূপ হেরে এই ফেরে না আঁখি
মনে লাগে সারাজীবন তাকায়েই থাকি।
কি যে শুভ্র সুনীল আকাশ
কি যে গন্ধ-মধুর বাতাস
কি বিচিত্র ফুলের বিকাশ
লক্ষবরণ পাখী।
মনে লাগে এম্নিতরই থাকি চাহিয়া
আর, চেয়ে চেয়েই যুগযুগান্ত যাউক বাহিয়া।
আকাশ-ভরা দৃষ্টি তাঁহার
দুলাক যত গীতি হিয়ার
আনন্দে গাই শোনাই তাঁরে
ঐ চোখে চোখ রাখি॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এস।

১´ ২ ৩ ১´ ২
[জ্ঞা মা]
II { মা মা -া | মা -পা | জ্ঞমা -পদা I দপা -মজ্ঞা রা | জ্ঞা -া[র] |
অ রূ • পে • রি • •• রূ • • প হে রে •

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
| [ম]জ্ঞা -া I ঋা সা -ঋা | সঋা -জ্ঞমা | জ্ঞঋা সণ্‌া I সা -া -া | -া -া |
এ ই ফে রে • না॰ •• আঁ• •• খি • • • •

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
| -া -া } I ণ্‌া সা -দা | দা -া | ণা -া[প] I পা পা -া | দপা -মজ্ঞা |
• • ম নে • লা • গে • সা রা • জী• ••

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
| রা -া I জ্ঞা পা -া[দ] | মপা -দণা | ণদা -পমা I মা -া -া | -া -া |
ব ন্ তা কা • য়ে॰ • ই থা• •• কি • • • •

৩
| -মা -পা II
• •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II পা -া মা | [প]দা -া | দা -ণা I ণা র্সা -া | দণা -র্সঋা | র্সা -া I
কি • যে শু • ভ্র • সু নী ল আ• •• কা শ্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্সা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা -া । র্জ্ঞা -া I র্ঋা র্জ্ঞর্ঋা -র্সণা । ণর্সা -র্জ্ঞর্ঋা । র্সা -া I
কি • যে গ ন্ ধ • ম ধু• •র বা• •• তা স্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা -পা পা । পা -া । পা -দা I র্সা র্সণা -দণা । দা -া । পা -া I
কি • বি চি • ত্র • ফু লে• •র বি • কা শ্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I মপা -দণা ণা । দা -া । দপা মা I ঋা মা -া । -া -া । -মা -পা II
ল• •• ক্ষ ব • র• ণ পা খী • • • • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II সা সা -া । সা -া । সা -ঋা I জ্ঞা -মা মা । মা -া । মা -া I
ম নে • লা • গে • এ ম্ নি ভ • র ই

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা জ্ঞা -া । সজ্ঞা -মদা । -ঋাঃ জ্ঞঃ I মা -া -া । -া -া । মা -া I
থা কি • চা• •• • হি য়া • • • • আ র্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I জ্ঞা জ্ঞা -া । জ্ঞা -া । রজ্ঞা -মা I জ্ঞা -া ঋা । সা -া । দা -ণা I
চে য়ে • চে • য়ে• ই যু গ্ যু গা ন্ ত •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা সা -ঋা । সঋা -জ্ঞমা । -ঋাঃ ণ্ঃ I সা -া -া । -া -া । -া -া II
যা উ ক্ বা• •• • হি য়া • • • • • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II মা দা -া । ণা -দা । দা -ণা I ণা -র্সা র্সা । দণা -র্সঋা । র্সা -া I
আ কা শ ভ • রা • দৃ ষ্ টি তাঁ• •• হা র্

১´ ২ ৩ ১´ ২
I র্জ্ঞা র্জ্ঞা -র্রা । র্জ্ঞাঃ -র্রঃ । র্জ্ঞা -া I র্জ্ঞা র্জ্ঞা -র্ঋর্সা । ণর্সা -র্জ্ঞর্ঋা ।
দ্যু লো ক্ ব • ভ • গী তি •• হি• ••

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
। র্সা -া I সা সা -পা । পা -া । পা -দা I র্সা র্সণা -দণা । দা -া ।
য়া র্ আ ন ন্ দে • গা ই শো না• •ই তাঁ •

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
। পা -া I মপা -দণা ণা । দা -া । দপা -মা I ঋা মা -া । -া -া ।
রে • ঐ• •• চো খে • চো• খ্ রা খি • • •

৩
-মা -পা II
• •

শিক্ষকতা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ।

(কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ)

আজকালকার দিনে অধিকাংশ গ্র্যাজুয়েটই স্কুলের শিক্ষক—আর তাঁদের সংখ্যাও অনেক বেশী। সুতরাং তাঁরা যে সমস্ত জীবনভোর ill-fed, ill-clad ও discontented সে বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ অনাবশ্যক। অথচ এই সকল শিক্ষকদেরই হাতে ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের শুভাশুভ নির্ভর করছে। স্কুলের ছেলেরাই আমাদের দেশের আশা-ভরসা। তাদের চরিত্রগঠন, তাদের মানুষ করে তোলার ভার শিক্ষকদেরই উপর পনেরো আনা ন্যস্ত। এমত ক্ষেত্রে তাঁরা যদি দুবেলা দুমুঠো পেটভরে' খেতে না পান— তাঁদের পোষ্যবর্গকে ভাল করে খাওয়াতে পরাতে না পারেন—একটুকু সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবার সুবিধা না পান এবং সেইজন্য সদাসর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট ও খুঁৎখুঁৎ করতে থাকেন, তাহলে তাঁরা নিজেদের কর্ত্তব্যসাধনে যে কতদূর সক্ষম হন সে সম্বন্ধে খুবই সংশয় আছে। সুতরাং অন্ততঃ শিক্ষার খাতিরে—যাতে সুশিক্ষার ব্যতিক্রম না হয় তারই জন্য, শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের ও সরকার বাহাদুরের দেখা উচিত যাতে প্রত্যেক শিক্ষকের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল হয়—যাতে প্রত্যেক শিক্ষক বেশ সুখশান্তি ও স্বস্তিতে থেকে নিজের কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পাদন করতে পারেন এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে দেশের সুসন্তান করে' গড়ে তুলে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করে যেতে পারেন। এই ব্যাপার নিয়ে অনেকদিন থেকেই অনেক রকমের আলোচনা-আন্দোলন চলছে কিন্তু এ যাবৎ ত তেমন কিছু ফল পাওয়া যায় নি, আর শেষে যে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে মরবে, তা এখন কেউ কিছু বলতে পারে না।

আচ্ছা, না হয় স্বীকার করা গেল (আর সেটা সম্পূর্ণ সত্য) যে, বর্ত্তমানকালে গ্রাজুয়েট স্কুল শিক্ষকদের— তথা সমস্ত শিক্ষকেরই অবস্থা বড়ই সঙ্গীন। তাঁরা পেট ভরে খেতে পরতে পান না, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গকে পেটভরে খাওয়াতে পরাতে পারেন না, নিজেকে বা পোষ্যদিগকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখতে পারেন না, আর সেই জন্য সদাসর্ব্বদা মনোদুঃখে থাকেন—সুতরাং তাঁরা যথারীতি আপনাদের কর্ত্তব্য সাধন করতে পারেন না, অথবা কতকটা ইচ্ছা করে করেন না। কিন্তু তাই বলে নীতির দিক দিয়ে দেখতে গেলে সেটা করা কি তাঁদের উচিত? যখন কোন লোক—তিনি গ্রাজুয়েট হউন বা নাই হউন, শিক্ষকতার পদ স্বেচ্ছায় বরণ করে' লন (তবে এখনকার দিনে অনেকস্থলেই শিক্ষকতা means to an end হয়ে পড়েছে— অর্থাৎ law পড়তে হবে—কিম্বা অন্য কিছু করতে হবে—কিছু টাকার দরকার; সুতরাং কিছুদিন শিক্ষকতা করে মাসিক যা' কিছু পাওয়া যায়—"শস্যঞ্চ গৃহমাগতম্"—তাতে অনেক বিষয়ে অনেকটা সুবিধা হতে পারে এই ভেবে অনেকেই শিক্ষকতা গ্রহণ করেন)—তা অল্প দিনের জন্যই হোক বা বেশী দিনের জন্যই হোক—তখন তাঁর বেশ করে বোঝা উচিত যে শিক্ষকতা একটা পবিত্র কর্ম্ম—ইহার দায়িত্ব অনেক; আর ঐ দায়িত্ব যথারীতি রক্ষা করতে না পারলে নিজেও প্রত্যবায়ভাগী হন আর সেই সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত ছেলের ভার তাঁর উপর দেওয়া হয় তাদের—শুধু নিজেদের নয়, তাদের বাপমাদের পর্য্যন্ত—বিশেষ অনিষ্ট করা হয়। আর যাঁরা চিরদিন শিক্ষকতা করে আসছেন, তাঁদের পক্ষে ঐ জিনিষটা আরও সুষ্ঠু ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। যখন তাঁরা যে কারণেই হোক—শিক্ষকতাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত বলে গ্রহণ করেছেন, তখন হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁদের সেই কর্ত্তব্যকর্ম্ম ভাল করে সম্পাদন করা বিধেয়। এস্থলে তাঁদের মনে করতে হবে যে তাঁদের পক্ষে শিক্ষকতা করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত—সুতরাং সর্ব্ববিষয়েই তাঁদের সংযমী হতে হবে—যে সমস্ত ভাল ভাল বিষয়ে ছাত্রদের যে যে উপদেশ দেন সেই সেই উপদেশ সর্ব্বপ্রথমে নিজেকে পালন করতে হবে, ছাত্রদের মানুষ করে তোলবার আগে নিজেকে মানুষ করে তুলতে হবে—নতুবা তাঁর শিক্ষায়, তাঁর উপদেশে কোন ফলই ফলবে না। "Example is better than precept"—এই নীতিবাক্য তাঁদের নিজের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে। এ সম্বন্ধে আমাদের একটী সুন্দর গল্প মনে পড়ল—গল্পটী এই।

"যখন হজরৎ মহম্মদ মদিনায় তাঁর নবপ্রবর্ত্তিত ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন ঐ স্থানে একঘর অতি দরিদ্র বৃদ্ধ দম্পতি বাস করত। তাঁদের একটীমাত্র ছোট ছেলে ছাড়া আর কেউ ছিল না। বুড়া বয়সের—সুতরাং অতি স্নেহের এই একমাত্র সন্তানের নানা আদর-আব্দার—বালকসুলভ নানারকম অত্যাচার তাঁরা হাসিমুখে ও নীরবে সহ্য করতেন। ছেলেটী যখন যা চাইত হাজার বাধাবিঘ্ন ও অসুবিধা সত্ত্বেও বুড়া-বুড়ীকে বিনা আপত্তিতে তৎক্ষণাৎ তা সরবরাহ করতে হতো। ছেলে যত বড় হতে লাগল, ততই তার আদর-আব্দারের মাত্রা বাড়তে লাগল। একে ত বুড়োবুড়ীর সংসারে খুবই অভাব অনটন—তার উপর ছেলের নিত্যই নূতন জিনিষের ফরমাস—তার বড় বেশী ঝোঁক ছিল সন্দেশ খাবার, এজন্য সে বুড়োবুড়ীকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। আর তারা ছেলের সন্দেশ কেনবার পয়সা জোটাতে পারে না—অথচ